তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া -১ম খন্ড

তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া

SZHM Trust ...
আলোকধারা বুকস্‌
এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন

চট্টগ্রাম।

তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া

শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট প্রকাশন
আলোকধারা বুকস্‌-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্‌জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ:
ডিসেম্বর ২০০৮
প্রথম সংস্করণ
১০ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ: **দি আলোকধারা প্রিন্টার্স**
ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্য: **১০০ টাকা মাত্র।**

ISBN 978-984-92208-4-8

প্রথম সংস্করণ প্রসঙ্গ

ডিসেম্বর ২০০৮ সালে তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে এর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হলে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট গবেষণা ও প্রকাশনা কমিটি'র পক্ষ থেকে এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রথম প্রকাশকাল এ ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীসহ তাঁর খলিফাদের ১৪ জনের জীবনী এতে প্রকাশিত হয়। একইসাথে তাসাওউফ বিষয়ক ৭টি প্রবন্ধও এতে প্রকাশিত হয়। বাস্তবতার আলোকে পাঠকের মতামতক্রমে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনী থেকে তাসাওউফ বিষয়ক প্রবন্ধগুলো আলাদা করে তা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ মোতাবেক 'তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া' এবং 'তাসাওউফ সংলাপ' নামে দুটো স্বতন্ত্র গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত করা হলো।

২০০৮ সালে প্রথম প্রকাশকালে এর মূল্যবান মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া প্রকাশনা পরিষদের চেয়ারম্যান, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী এবং ভূমিকা প্রণয়ন করেছিলেন তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়ার সম্পাদক ও সমন্বয়ক প্রফেসর ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী। এ দুটো স্বব্যাখ্যাত মূল্যবান বর্ণনায় গ্রন্থ প্রকাশের সামগ্রিক বিষয় উঠে এসেছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে। তাই এতদবিষয়ে আর পুনরোক্তি প্রয়োজন পড়েনা।

প্রথম সংস্করণকালে দুটো নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হলো (১) মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী প্রণীত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীর জীবনী, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর প্রণীত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের জীবনী এবং মাওলানা সৈয়দ আবদুল গনি কাঞ্চনপুরীর জীবনী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারী খলিফাদের অনেকের জীবনী সংগ্রহ ও কালের ক্রমানুসারে সাজানোর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। এতদবিষয়ে জীবনী সংগ্রহ এবং তা যথাযথভাবে প্রকাশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের পরামর্শ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর
আহ্বায়ক
তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া
প্রথম সংস্করণ
dr.salimjahangir1955@gmail.com

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহ্। ইসলামী দর্শন ও চেতনা বিকাশের ইতিহাসে আবু নুয়াইস, আস্-সুলামী, ইমাম কুশাইরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ সুফিয়া-ই কিরামের জীবন চরিত সংগ্রহ এবং রচনার যে প্রয়োজন ও তাগিদ অনুভব করেছিলেন, সেই একই প্রয়োজনে এবং তাগিদে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অন্তর্ভুক্ত মহান আউলিয়া-ই কিরামের জীবন চরিত প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সূর্যের আপাতঃ দৃশ্যমান সাদামাটা আলো প্রিজমের ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হলে এই আলোর ভেতরকার বর্ণিল প্রাণময়তা, এর বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা যে রকমটি দৃশ্যমান হয়, তেমনি করে ইসলামের নৈতিক আদর্শ এবং আদেশ-নির্দেশের কাঠামো, আউলিয়া-ই কিরামের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে এর প্রাণশক্তি, প্রাগ্রসরতা, বহুমাত্রিকতাকে জগতের সামনে দৃশ্যমান করে থাকে।

সুফিয়া-ই কিরাম ইসলামের প্রাণশক্তিকে নিগূঢ়ভাবে আত্মস্থ করে এত অগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলেন যে, সমসাময়িক অনেক আইন প্রণেতা বহু সময় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারেননি, যদিও সময়ের আবর্তন এ মহান ব্যক্তিগণের সঠিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আউলিয়া কিরামের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনে অক্ষমতা অনেক সময় সাধারণ মানুষ, এমনকি ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিকে সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ করে, চরমপন্থায় আচ্ছন্ন করে। যুগের বিভ্রান্তি এবং জটিলতা থেকে মুক্ত থাকার প্রয়োজনে আউলিয়া-ই কিরামের জীবন-চরিত পাঠ এই জন্য সর্বসময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের বিরলগ্রন্থ 'তায্কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ রাখছি। আমি গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি। আল্লাহ্ হাফেজ।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া হক মন্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।
এবং
চেয়ারম্যান, 'তায্কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া' প্রকাশনা পরিষদ
ও
মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

নবুয়তের পরিসমাপ্তির পর সুশৃঙ্খল পন্থায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধের কাঙ্খিত বিকাশের লক্ষ্যে মানুষের জীবনাচরণের প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, অনুশীলন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন অলি-আল্লাহ্‌গণ। তাই আমরা ইতিহাসে কখনো তাঁদেরকে দেখি মানুষের উপর মানুষের শোষণ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হিসেবে, কখনো সংস্কারক হিসেবে, কখনো করুণা, সহনশীলতার মূর্ত প্রতীকরূপে। গাউসুল আযম, নুরুল আলম, ফানাফিল্লাহ্‌, বাকা বিল্লাহ্‌, হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এমনই এক মহান খোদাদাদ সূর্য যিনি মানুষের স্বাধীন চেতনাকে অমলিন ও কল্যাণকর পন্থায় সংরক্ষণ ও বিকাশের যুগোপযোগী নির্দেশনা দিয়েছেন মুক্তির সপ্ত পদ্ধতি বা "উসূলে সাব'আ" এর মাধ্যমে, যাকে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের নির্যাস হিসেবে অভিহিত করা যায়। মাইজভাণ্ডারী দর্শন মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পারস্পরিক সম্পর্কের মূলসূত্র হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম। মাইজভাণ্ডারী দর্শন জীবন-বিমুখ, লোক-বিমুখ, সমাজ-বিমুখ, পরকাল সর্বস্ব একটা কাল্পনিক বস্তু নয়; বরং বাস্তব জীবনে সৎ ও পবিত্র থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মহান শিক্ষা। মাইজভাণ্ডারী দর্শন মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকতে, মানুষকে ভালবাসতে এবং মানুষের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে। এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের স্বার্থে তারা যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প, ধার্মিকতাবিহীন ধর্মচর্চা ও ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করে স্বার্থসিদ্ধির মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের মূল্যবোধকে ধ্বংস করছিল, ঠিক তখন মহান আধ্যাত্মিক সাধক হযরত আকদাস মাইজভাণ্ডারী (ক.) তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকার হিসেবে উপস্থাপন করলেন এ দেশের মাটি, মানুষ ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মাইজভাণ্ডারী দর্শন; যা প্রতিবাদ জানালো ধার্মিকতাবিহীন পোশাকী ধর্মচর্চা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ- বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং অবির্ভূত হলো বিশ্বমানবতার স্রষ্টা-অনুমোদিত শান্তিধারা রূপে, বিশ্বমানবতার কল্যাণদিশারী এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তির প্রতিভাসরূপে। আজ জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক এবং ব্যক্তি থেকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যে নৈরাজ্য ও নৈরাজ্যের অগ্নিবলয়ের অসহনীয় চাপ পড়ছে, তা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যে পথে অগ্রসর হতে হবে, সেটা হল বেলায়তের পথ এবং এ পথে চলার জন্য অন্যতম অনুসরণীয় দর্শন হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্‌ভিত্তিক মাইজভাণ্ডারী দর্শন। এ দর্শনে শান্তি ও কল্যাণের দিক-নির্দেশনা রয়েছে। জীবনকে বিশুদ্ধতম আলোকে রাঙিয়ে তুলতে হলে, মহত্তম জীবন-নন্দিত মনুষ্যত্বে মানবতাকে ধন্য করতে হলে, স্রষ্টার

সান্নিধ্য-সুন্দর পবিত্রতায় নিজেকে অভিষিক্ত করতে হলে, অবিচল ঘনিষ্ঠ অনুশীলনের মানবিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিকাশ দান করতে হলে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদাস (ক.)-এর অনিঃশেষ মেহেরবাণীর উপলব্ধি ও চেতনায়, প্রেমের নিরূপম ব্যঞ্জনায় স্বীয় বোধ ও বোধনকে সমর্পিত করতে হবে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মহাসাগরে। সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও চরমপন্থাকে পরিহার করে সহজ, সরল, মানবিক ইসলামের যে আলোক বর্তিকা হযরত আকদাস (ক.) তুলে ধরেছিলেন, তা যে আজ কতটা প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক, আজকের বাংলাদেশের নাজুক পরিস্থিতি থেকে তা' সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ভয় ও ভালবাসাপূর্ণ আনুগত্য, তাঁর নির্দেশ পালনে একনিষ্ঠতা, রাসূল করিম (দ.)-এর প্রতি আনুগত্য, ভালবাসা, আল্লাহ্তায়ালার প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা তথা অলি-আল্লাহ্গণের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি নির্মাণ ও সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার যে তাগিদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), অছি-এ-গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ.) এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (রহ.) দিয়ে গেছেন, সে ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্যই গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন আলহাজ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ)-এর আন্তরিক উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দিক-নির্দেশনাকে জাতির সামনে, বিশ্বের সামনে সহজবোধ্যভাবে ব্যাপকভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে। ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ও জাতি গঠনে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অনুসারীদেরকে ব্রতী হতে হবে এবং সমালোচকদের মধ্যে বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। মানব কল্যাণ ও মানবসেবার উদাহরণকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। জ্ঞান-নির্ভর মানসিকতা গঠনের ব্যাপক সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের কর্ম, ধর্ম এবং জ্ঞানের সামনে যাতে ভ্রান্ত মতালম্বী তথা বাতিলেরা নির্বাক কিংবা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়, সেভাবে সকলকে তৈরী হতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ইহ্সানের প্রতি ইনসাফ করতে সক্ষম হবো। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট গবেষণা ও প্রকাশনাকে অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানবতার মুক্তির জন্য যুগোপযোগী মাইজভাণ্ডারী দর্শন প্রদান করে এবং নিজেকেই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে হযরত আকদাস (ক.) এক মহান বিপ্লব ঘটিয়েছেন। সৃষ্টির করুণা ভাণ্ডার রহমতুল্লিল আলামীন রাসূলে করিম (দ)-এর অনন্ত বেলায়তী শক্তির অন্যতম উত্তরাধিকারী হযরত আকদাস (ক.) বিশ্বমানবতার যুগভিত্তিক সমস্যার সমাধান ও সার্বিক মুক্তির যে খোদাদাদ হেদায়েতধারা লাভ করেন, তারই নাম মাইজভাণ্ডারী দর্শন। এই দর্শনের মাধ্যমে নীতিমালা ভিত্তিক মানব চরিত্র

গঠনে শুরু থেকে এ পর্যন্ত বহু সাধক ও বুজুর্গানে দ্বীন অবদান রেখেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে এ দর্শনের ফসল অসংখ্য অলি-ই কামিলের অবস্থান রয়েছে, তিরোধানের পরও যাঁদের আস্তানা ও মাজারে মানুষের অবারিত যাতায়াত অব্যাহত রয়েছে। এ সকল অলি-ই কামিলীনদের বিভিন্ন অজানা তথ্য ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং সুফীবাদভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের কুরআন-সুন্নাহ্ সমর্থিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সকলকে অবহিত করার লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারী একাডেমী নিয়মিতভাবে 'রূহানী সংলাপ' শীর্ষক মাসিক সেমিনার বা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছে। এ 'রূহানী সংলাপ' অনুষ্ঠানে পঠিত/ আলোচিত মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত কতিপয় অলি-ই কামিলীনের জীবন চরিত এবং মাইজভাণ্ডারী দর্শন/সুফিবাদ/ত্বরিকত বিষয়ক প্রবন্ধের একটি সংকলন হিসেবে এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের অধিভুক্ত আলোকধারা বুক্‌স 'তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া' নামে বর্তমান গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার পশ্চাতে যাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা, অনুপ্রেরণা, সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদেরকে সাহস যুগিয়েছে তিনি হলেন গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন এবং মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর মহামান্য প্রধান পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ)। আমি আলোকধারা বুক্‌সের সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যে সকল ভক্ত-অনুসারীগণ মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানবার আগ্রহ নিয়ে ব্যাকুলতায় প্রহর গুণছেন বহুদিন থেকে এবং যাঁরা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের ভক্ত কিংবা অনুসারী নন অথচ মাইজভাণ্ডারী দর্শন সম্পর্কে জানবার জন্য কৌতুহলী মনোভাব নিয়ে এরূপ একটি প্রকাশনার জন্য অপেক্ষা করে আছেন, বর্তমান গ্রন্থটি তাঁদের সে চাহিদা কিছুটা হলেও মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশে যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক দৈনিক আজাদী'র সহকারী সম্পাদক এবং 'মাসিক আলোকধারা'র সম্পাদক জনাব মোঃ মাহবুব উল আলম। তাঁর সহযোগিতা না পেলে এ গ্রন্থ প্রকাশ সহজসাধ্য হতোনা। তাঁর প্রতি মাইজভাণ্ডারী একাডেমী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ।

মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সাবেক সভাপতি, এ গ্রন্থের প্রকাশনা পরিষদের অন্যতম সম্মানিত সদস্য ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী হচ্ছেন এ গ্রন্থ প্রকাশের মূল প্রস্তাবক। তাঁকে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সহ-সাধারণ সম্পাদক ও প্রকাশনা পরিষদের অন্যতম সদস্য জনাব আলহাজ্ব সামশুল আনোয়ার মাস্টার (মরহুম) এ গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ, লেখা সংগ্রহ ও যোগাযোগের কাজে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমি তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করি। প্রকাশনা পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে, অধ্যাপক ও আইনবিদ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা খায়রুল বশর হক্কানী, সৈয়দ আবু তালেব এবং অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খানের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এ গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল প্রুফ পাঠক, প্রচ্ছদ প্রকল্পক, মুদ্রণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বাইণ্ডার প্রমুখের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ থাকলাম।

মাইজভাণ্ডারী দর্শন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে অপব্যাখ্যা কিংবা স্বার্থান্ধ ব্যাখ্যার দ্বারা বিভ্রান্ত না হবার জন্য এবং সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার অন্বেষণ ও অবলোকন এবং মহাসত্যকে অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণে ব্রতী হবার জন্য আমি সকল পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। এ প্রসঙ্গে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.), হযরত অছি-এ-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.), আওলাদে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মুরিদানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মুহিব্বানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং আশেকানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতি; যাঁদের উৎসর্গ, অবদান, অনুপ্রেরণা ও উপস্থিতি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বিস্তৃতিকে বেগবান করেছে, চলমান রেখেছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীদের মেহেরবাণীর চাদর সকলের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের উসিলা হোক; মহান আল্লাহ্তায়ালার কাছে এ ফরিয়াদ জানাই। গ্রন্থটির মুদ্রণজনিত প্রমাদ ও সকল প্রকার ভুলত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ জানাই। আমি গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করছি। মহান আল্লাহ্তালা এ মহান প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল মোরসালিন।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
সভাপতি
গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
এবং
প্রাক্তন প্রফেসর
অর্থনীতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ
২৪ ডিসেম্বর ২০১৮

সূচী

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১২
পল্লী কবি জসীম উদদীন

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ১৬
পল্লী কবি জসীম উদ্দীন

বেলায়তে মোত্লাকার দ্বার উম্মোচক, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৮
মুফ্তি সালেহ্ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী

মাহবুবে এলাহী, ইউসুফে সানী, গুলে গোলাব, গাউসুল আযম-বিল-বিরাসত, হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কা'বা (ক.) ৩২
মুফতি আবুল ফজল মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী, মাইজভাণ্ডারী

কুতুবুল ইরশাদ হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (রহ.) মাইজভাণ্ডারী ৪০
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ.)-এর জীবন সাধনার ব্যবহারিক তাৎপর্য ৪৬
ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

সুফিবাদ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন : প্রসঙ্গ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ৫৮
ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন, দর্শন, কারামত এবং এর ব্যবহারিক তাৎপর্য ৬৩
জামাল আহমদ সিকদার

মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক মহাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র গাউসে মাইজভাণ্ডারীর প্রথম ও প্রধান খলিফা, কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী (ক.) ৭০
শেখ আবু মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফারুকী

ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বিশিষ্ট খলিফা, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার যথার্থতার পক্ষে শরয়ী দলিল প্রদানকারী ও অতন্দ্র প্রহরী ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদদের অন্যতম সুন্নীয়তের সর্ববৃহৎ স্তম্ভ আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী রাদ্বিয়াল্লাহুতা'লা আনহু'র সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ৭৫
শাহ্জাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফুল হক

আমিরুল আউলিয়া সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামান (ক.) ৮২
সৈয়দ ফরিদুল আবছার আমিরী

কুতুবে জমান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা (ক.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও কারামত ৮৮
আলহাজ্ব শাহ্ সুফি সৈয়দ এ জেড এম শেহাব উদ্দিন খালেদ

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.) ৯২
সৈয়দ নুর আহমদ বাবর

মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল গণি চৌধুরী মাইজভাণ্ডারী (রহ.) ৯৬
অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল গণি চৌধুরী

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ রজব আলী আল শাকরাপুরী (রহ.) ৯৯
পীরজাদা সৈয়দ মেসবাহ উদ্দীন আহমদ

হযরত মাওলানা শাহ্ সোলতান সৈয়দ জমির উদ্দিন আহমদ নূর নগরী (ক.) ১০২
পীরজাদা এ কে এম রওশন মিঞা

হযরত আবদুল মজিদ শাহ্ আজিমনগরী (ক.) ১০৬
সৈয়দ জাহেদুল আলম

হযরত গাজী মাওলানা এয়াকুব আলী (রহ.) ১০৯
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন লিটন

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ফানাফিশ্-শাইখ বাহারুল উলুম আল্লামা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) ১১১
মাওলানা শায়েস্তা খান আল আজহারী

মকবুলে বারগাহে সম্‌দানী ওয়াকিফে আসরারে রহমানী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রহ.) ১১৪
মাওলানা বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি
সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

পল্লী কবি জসীম উদদীন

বাংলা ১২৩৩ সনের পহেলা মাঘ চট্টগ্রাম হইতে অনতিদূরে মাইজভাণ্ডার গ্রামে পীর আহম্মদুল্লাহ্ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ মতিউল্লাহ্ এবং মাতার নাম বেগম খায়েরুন্নেছা বিবি।

গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া যুবক আহম্মদুল্লাহ্ ১২৬০ হিঃ সনে কলিকাতার আলিয়া মাদ্‌রাসায় আসিয়া ভর্তি হইলেন। সেখানে তিনি জমায়াতে উলা পাশ করিয়া ১২৬২ হিজরীতে যশোর জেলার কাজী পদে নিযুক্ত হইলেন।

১২৭০ হিজরীতে তিনি যশোর জেলার কাজী পদ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার মুন্সী বোয়ালী মাদ্‌রাসার প্রধান মোদার্‌রেছ নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া তিনি ছাত্রদিগকে কুরআন হাদীসের পাঠ শিক্ষা দিতেন। তদুপরি মুন্সেফী আইন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আর গোপনে ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটাইতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে তিনি মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হইয়া যাওয়ায় সে বৎসর সমগ্র পরীক্ষাই বাতিল হইয়া যায়। ইহাতে আপাততঃ তিনি বড়ই মনোকষ্ট পাইলেন। কিন্তু যিনি পরিণামে অগণিত জন মানুষের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে মুন্সেফী চাকুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়তো খোদার ইচ্ছা ছিল না। সেই সময় তিনি প্রায়ই সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতে যাইতেন। একবার তিনি পাল্‌কী করিয়া কোথাও ওয়াজ মাহফিলে যাইতেছেন, এমন সময় তৎকালীন প্রসিদ্ধ পীর সুফি সৈয়দ আবু সাহামা সালেহ তাঁহাকে পাল্‌কী হইতে নামাইয়া অতি মৃদুভাবে কিছু কথাবার্তা বলিলেন। পীর সাহেবের কথা-বার্তায় যুবক আহম্মদুল্লাহ্ বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বার বার তাঁহার আস্তানায় যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম সাধনায় যুবক আহম্মদুল্লাহ্‌র উচ্চ আসন জানিতে পারিয়া আবু সাহামা সাহেব তাঁহাকে তাঁর বড় ভাই দেলওয়ার আলী সাহেবের নিকট যাইতে বলিলেন। দেলওয়ার আলী সাহেব অতি স্নেহের সাথে তাঁকে গ্রহণ করিয়া নানারূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। এই সময় ইবাদত বন্দেগীতে তিনি এত সময় ব্যয় করিতেন যে, তাঁর শরীর ধীরে ধীর নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। হিজরী ১২৭৫ সনে তাঁহার পিতা সৈয়দ মতিউল্লাহ্ সাহেব এন্তেকাল করেন।

মায়ের অনুরোধে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সাংসারিক সকল ব্যাপারেই তিনি উদাসীন। ৩২ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় মায়ের পুনঃপুনঃ অনুরোধে লুৎফুন্নেছা বিবির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন সম্পাদিত আহম্মদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের মতে এ স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপলাবণ্যময়ী রমণী ছিলেন।

ইহার পরে পীর সাহেব অধিকাংশ সময়ই ইবাদত বন্দেগীতে কাটাইতে লাগিলেন। এখন আর কোথাও ওয়াজ নছিয়ত করিতে যান না। কোন অর্থ উপার্জনও করেন না। এজন্য তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে খুবই অর্থকষ্টে পড়িতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। তাঁহারা পীর সাহেবের দরবারে সর্বদা ঐশী প্রেমের গান বাজনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে গোঁড়া মৌলভী সমাজে কেহ তাঁহাকে জব্দ করিতে আসিয়া তাঁহার মহত্ব ও ভালাবাসায় সমস্ত হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহম্মদুল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থে বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। তাহার কতগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. হযরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগমুক্তি।
২. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহসেনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত।
৩. হযরতের কশ্ফ ক্ষমতায় হাটহাজারী মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ। (কওমী)
৪. হযরতের প্রভাবে আহমদীয়া মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন।
৫. হযরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হইতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার।
৬. আনার প্রদান হযরতের আশ্চর্য কেরামত।
৭. মসজিদে হযরতকে নুরানী জ্যোতির্ময় দেখা।
৮. স্বপ্নযোগে হযরতের বেলায়েতের পরিচয়।
৯. বেলায়েতি ক্ষমতায় হযরত কর্তৃক রোগমুক্তি।
১০. স্বপ্নযোগে বাতেনী এলেম শিক্ষাদান।
১১. হযরতের ফয়েজ এর্শাদ ও পরিচয়, জনাব মৌলভী আবদুর রহমান সাহেবের প্রতি রহস্যময় বাণী ও ফয়েজ এর্শাদ।
১২. মহাজেরে মক্কীর ছালামের উত্তর দানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও ছালাম প্রেরণ।
১৩. তাবারৌক প্রদানে সন্তান দান।
১৪. খানবাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ।
১৫. মুর্দাদের প্রতি হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া।
১৬. হযরতের বেলায়েত প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতাদান।
১৭. কলা মারফত জাফর আলী শাহকে কশ্ফ শক্তিদান।
১৮. সাগর জলে হযরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন।
১৯. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হইতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাবর্তন।
২০. আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা-মদীনা শায়ের।
২১. হযরতের বেলায়েতি ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন।
২২. হযরতের বেলায়েতি ক্ষমতায় নাজিরহাট হইতে বাজার প্রেরণ।

২৩. সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব।
২৪. হযরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্য।
২৫. মহামারী আপদ-বালাই প্রভৃতির উপর হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব।
২৬. হযরতের প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে কলেরা রোগ নিরাময়।
২৭. যষ্টির আঘাতে কুষ্ঠরোগ নিরাময়।
২৮. ব্যাঘ্রের কবল হইতে প্রাণরক্ষা।
২৯. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত।
৩০. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধে তিক্ত স্বাদ।
৩১. হযরতের জুতার ধূলায় দুরারোগ্য রোগমুক্তি।
৩২. হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ।
৩৩. হযরতের বেলায়তি প্রভাবে মৃত্যুকালে আযরাইল ফেরত ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি।
৩৪. হযরতের প্রভাবে অল্প খাদ্যে তুষ্টি।
৩৫. মূকের প্রতি কুরআন পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামতি।
৩৬. হযরতের অসাধারণ ক্ষমতা হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও রায় দান।
৩৭. হযরত খিজির (আ.)-এর সঙ্গে হযরত এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক।
৩৮. মজহাবী মহফেলে হযরতের অদ্ভুত উপস্থিতি।
৩৯. বিনা ঔষধে হস্তপচা ও ক্ষতনালী আরোগ্য।
৪০. হযরতের স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হইতে নিরাপদে রাখার আভাস ও অভয়দান।
৪১. ওফাতের পর হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শনদান।
৪২. হযরতের ওরশ শরীফে উট বুকিং-এ আশ্চর্য কেরামত।
৪৩. দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শন দানে কেরামত।
৪৪. হযরতের প্রভাবে আয়ুবৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ।

মাওলানা সুফি দেলাওর হোসাইন সাহেব রচিত আহম্মদ উল্লাহ্ পীর সাহেবের জীবনী গ্রন্থে এরূপ বহু ঘটনা রহিয়াছে, তাহার সবগুলি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করিতে পারিলাম না।
পীর সাহেব গান শোনেন। শিষ্যশাবক লইয়া উচ্চৈস্বরে জিকির করেন। ইহা লইয়া একদল মাওলানা তাঁহার শিষ্যদের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আজিমনগর নিবাসী মাস্টার ফয়জুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে মওলানা মহীউদ্দিন নামক এক বক্তিকে মাইজভাণ্ডার ত্বরিকামতে হালকা জিকিরের বিরুদ্ধে ওয়াজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। পীর সাহেবের শিষ্যরাও এই তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত হন। কিন্তু পীর সাহেব সাগরেদদিগকে বলিলেন, 'মৌলভী সাহেবেরা মুছবী ত্বরিকার লোক। খিজিরী কাজ কারবার কি বুঝবেন? তোমরা বাহাস করিও না। আপন মনে জিকির করিয়া যাও। খোদাপ্রেমে মশগুল থাক। তারা তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।'

সত্য সত্যই সভার নির্দিষ্ট দিনে পীর সাহেবের শিষ্যরা হালকায়ে জিকির ও গান গাহিতে গাহিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। মাওলানা মহীউদ্দিনের সভার লোকজন তাহার দলে আসিয়া যোগদান করিল।

ইংরেজী ১৯০৬ সালে বাংলা ১৩১৩ সনের ১০ই মাঘ রাত একটার পর এই পীর সাহেব ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যান। প্রতি বৎসর এই সময়ে মাইজভাণ্ডারে ওরশ সমাধা হয়। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে জমায়েত হয়। তিন চার দিন ভক্তবৃন্দ নানা ক্যাম্পে ও কুঠুরীতে থাকিয়া আপন ইচ্ছামত গান-বাজনা ও জিকির করিয়া থাকেন। কেহ কাহাকে বাধা দেয় না।

রাত বারটার পর গানবাদ্য, সামা, জিকির বন্ধ করিয়া হযরতের ফাতেহাখানি সমাধা করা হয়। ১৩ই মাঘ দিবাগত রাত্রে বিপুল আয়োজনে তাঁহার চাহারম শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে পীর সাহেবের ধনী ভক্তেরা শত সহস্র গরু ও উট আনিয়া উপহার দেন। চাল ডাল আহার্য দ্রব্যসামগ্রী কত যে আসে তাহার কোন নিরাকরণ নাই।

প্রতি বাংলা মাসের ১০ তারিখে পীর সাহেবের মাসিক ফাতেহা কার্য সমাধা হয়। তখনও কিছু কিছু ভক্ত দরগায় আসিয়া সমবেত হন।

[পল্লী কবি জসীম উদদীন বিরচিত ‘মুর্শীদা গান’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ
গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)

পল্লী কবি জসীম উদদীন

হযরত আকদাছের ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান আল হাসানী আল মাইজভাণ্ডারী পীর সাহেবের জীবনী আলোচনা না করিলে মাইজভাণ্ডারের কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তাঁহার হুজরায় প্রতি বৎসর ২২ শে চৈত্র মহাধুমধামের সহিত ওরশ সমাপন হয়। এই উপলক্ষে হযরত আকদাছের হুজরায় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া সঙ্গীত ও নৃত্যযোগে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

গোলামুর রহমান সাহেব অতি অল্প বয়স হইতেই হযরত আকদাছের অর্থাৎ হযরত আহম্মদ উল্লাহ্ (ক.) সাহেবের খেদমতে হাজির হইতেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বাবুনগর নিবাসী মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি আসরাফ আলী সওদাগরের বাড়িতে জায়গীর থাকিতেন। এই সময় তিনি দিবা-রাত্রের মধ্যে মাত্র একবার সন্ধ্যায় আহার করিতেন, আর অধিকাংশ সময় খোদাই-ধ্যানে মশগুল থাকিতেন।

মাদ্রাসায় দুইদিন পরীক্ষা দেওয়ার পর পীর আকদাস আহম্মদুল্লাহ্ সাহেব তাঁহাকে বাড়িতে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। অবশিষ্ট পরীক্ষা না দিয়াই তিনি বাড়ি ফিরিয়া পীর আকদাসের খেদমত করিতে লাগিলেন।

এই সময় মাঝে মাঝে তিনি এখানে-সেখানে ওয়াজ করিতে যাইতেন। তাঁহার ওয়াজ শুনিয়া শত শত লোক কাঁদিয়া জারজার হইত। ইহার পরে তিনি খোদাপ্রেমে এমনই মশগুল হইয়া পড়িলেন যে দাওয়াতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন তাহা শুনিয়া সমবেত লোকেরা কাঁদিয়া জারজার হইলেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন হযরত আকদাস চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। যুবক গোলাম রহমান দরজার সামনে দাঁড়াইয়া সারারাত্র কাটাইয়া দিলেন।

পরদিন হইতে তাঁহার আর এক অবস্থা হইল। এখন তিনি আর হযরত আকদাসের নিকট যান না।

দূর হইতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন। চোখে পলক পড়ে না। কোন কোন সময় চারিদিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিয়া এভাবে বরজক ধ্যানে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া সামান্য কিছু আহার করাইতেন।

ইহার পরে আবার তিনি হযরত আকদাসের সামনে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইতে লাগিলেন।

আত্মীয় স্বজনগণ অনেক কষ্টে তাঁহাকে ছাড়াইয়া আনিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তিনি দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া আবার পীর আকদাছের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। উহার কিছুদিন পর তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মাওলানা সৈয়দ আবদুস সালাম ইছাপুরি লিখিত জীবন চরিত্রে এই ভ্রমণের অনেক অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত আছে। কৌতুহলী পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিবেন। এখানে দুই একটি উল্লেখিত হইল।

এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে ভীড় এড়াইবার জন্য তিনি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতেন। তাহাতে লোকের ভীড় আরও বাড়িতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তিনি গভীর অরণ্য পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি কোথায় গিয়াছেন কেহই জানে না। ভক্তেরা তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন, কিন্তু কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। নেছার আহম্মদ মুন্সী নামক এক ভক্ত খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তিনি পীর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পীর সাহেব এক পাহাড়ের উপর উঠিয়া স্বল্প পরিসর একটি ফাঁকা জায়গায় যাইয়া বসিলেন।

মুন্সি সাহেব বলেন, সেখানে সাদা পোশাক পরিহিত বহুলোক আসিয়া পীর সাহেবকে সালাম ভক্তি করিয়া তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। রাত প্রভাত হইতে তাঁহারা একে একে উঠিয়া পীর সাহেবকে আবার সালাম করিয়া চলিয়া গেলেন। মুন্সী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহারা কারা?'

পীর সাহেব বলিলেন; 'উহারা খোদার সৈন্য সামন্ত'। ইহার পর তিনি আরও গভীর জঙ্গলের পথে চলিতে লাগিলেন। একদল রাম কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া তাড়িয়া আসিল। পীর সাহেব মুখে কিছু বলিতেই তাহারা নীরবে চলিয়া গেল।

অনতিদূরে এক জুমিয়া পল্লীতে তিনি প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক জুমিয়া রোগীকে আরোগ্য করিয়া বহু জুমিয়ার ভক্তির পাত্র হইলেন।

ইহার পরে তিনি বহুদিন উত্তর পাহাড়ে নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি হুজরায় ফিরিয়া আসেন এবং বহু ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া খোদাই জিকিরে মগ্ন থাকেন।

১৩৪৩ বাংলা সনের ২১ শে চৈত্র তিনি তাঁহার হুজরা শরীফে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। ভক্তমন্ডলী তাঁহাকে ঘিরিয়া সর্ব সময় জিকির আসগর করিতে লাগিলেন। ২২ শে চৈত্র ইংরেজী ৫ই এপ্রিল তিনি উত্তর দক্ষিণে সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবাছু বাহির হইয়া গেল।

[পল্লী কবি জসীম উদদীন বিরচিত 'মুর্শীদা গান' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

বেলায়তে মোত্‌লাকা'র দ্বার উন্মোচক, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মুফ্‌তি সালেহ্ সুফিয়ান ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী

হাম্‌দঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি খাতেমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পরে, তাঁর মনোনিত ইসলাম ধর্মের মূল মর্ম 'মারিফাত' বা তাওহীদ প্রচারের জন্য অসংখ্য অলি-দরবেশকে ভবে প্রেরণ করেছেন।

দরূদ-সালামঃ সমস্ত দরূদ সালাম হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর যিনি মক্কা শরীফের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত গাউসুল আযম জিলানী ও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে, গাউসে আযমিয়তের তাজ দিয়ে জগতবাসীর অন্তরে তাওহীদের (আল্লাহ্‌র) প্রেম প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার জন্য বেলায়তে মুকাইয়াদাহ ও মোতলাকার হেকমত ও প্রভাব দানে মেহেরবাণী করেছেন।

শুকরিয়াঃ যাবতীয় শুকরিয়া জগতের সমগ্র অলি দরবেশের তরে, বিশেষ করে ক্বাদেরিয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম জিলানী ও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে যাদের ফছুজাত বিশ্বে অনবরত আছে।

শুভাগমনের পূর্বাভাসঃ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ ধরায় তশরীফ আনার পূর্বে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার বহু পূর্বাভাস পূর্ববর্তী আম্বিয়া-ই-কিরাম ও নিজ মাতা হযরত মা আমিনা (রাদিঃ) বর্ণনা করেছেন, তদ্রূপ বেলায়তে মোত্‌লাকার ধারক, বেলায়তে উজমার তাজ-এ-আহমদীর বাহক, গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর পৃথিবীতে শুভাগমনের পূর্বাভাস পূর্ববর্তী আউলিয়া-ই কিরাম ও নিজ পিতা শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহ.) বর্ণনা করেছেন। যেমন ৫৮৬ বৎসর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী নিজ কিতাব "ফুসুসুল হেকমে" গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শুভাগমনের ভবিষ্যৎবাণী করেন। নূরনবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আব্বাজান হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাদিঃ) স্বপ্নযোগে (মাধ্যমে) আভাসপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্ববাসীর প্রতি সাংকেতিক ভবিষ্যৎবাণী প্রকাশ করেন, "মুহাম্মদী নূর শক্তি দুইভাগে বিভক্ত হইবে। একভাগ আরবে উজ্জ্বলিত হইয়া সারা বিশ্বভূবন আলোকিত করিবে। অপর ভাগ মূলকে আযমে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে উদিত হইয়া নিখিল ধরণীর অন্ধকার দূরীভূত করিবে" (গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত পৃষ্ঠা ঃ ১৬-১৭ ও মওলুদে দিল পঞ্জির পৃষ্ঠা-১৪/১৫ দ্রষ্টব্য)।

অনুরূপভাবে হযরতের আব্বাজান হযরত মাওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ্ সাহেব (রহ.)'র ও একই প্রকার এলহাম হয় (জীবনী ও কেরামত পৃষ্ঠা-১৮)। বিস্তারিত জানার জন্য অছি-এ-গাউসুল আযম রচিত ত্বরিকত পন্থীগণের জন্য উচ্চমার্গীয় গ্রন্থ "বেলায়তে মোত্‌লাকা" পাঠের অনুরোধ রাখি।

জন্মস্থান চট্টগ্রামের শরাফত: তাঁর জন্মস্থানের নাম চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার মাইজভাণ্ডার গ্রাম। এ চট্টগ্রাম জেলাকে সুফি পরিভাষায় চট্টগ্রাম শরীফ বলা হয়। কেননা এর শরাফত সম্পর্কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে অনেক জ্ঞানী-গুণী বিভিন্ন ভাষায় তাঁদের লিখনীতে মন্তব্য পেশ করেন। কেউ বলেন, "প্রাচ্যের রাণী" ইবনে বতুতা বলেন, "সবুজ শহর", বাহরুল উলুম সৈয়দ আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী আল-মাইজভাণ্ডারী (রহ.) আয়নায়ে বারীর ৯৭ পৃষ্ঠায়, (দ্বিতীয় প্রকাশ) বলেন–

মজ্‌দায়ে রহমত কী হারদম্ ছাঁটগাম কু,
হারগিজ নিহি কেছি তরেহ গম্ ছাটগাম কু।
বারানে রহমত্ খোদা বরস্তি হে ছদা,
খোদায়ে পাককা হে করম ছাটগাম কু।
হার হার জাগে গুজব হে আউলিয়া এ কেরাম,
নবী কা বিহি হে নকশ ক্বদম ছাট গামকু।

ভাবার্থঃ চট্টগ্রামে অনবরত আল্লাহ্‌র রহমতের শুভ সংবাদ, চট্টগ্রামের অধিবাসীর কোন প্রকার চিন্তা নেই, আল্লাহ্‌র রহমত এখানে সর্বদা ঝরতে থাকে, এর প্রতি গলিতে অলি-আল্লাহ্‌র পদচরণ, নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কদম শরীফের নক্‌শাও এখানে আছে। আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) ফতওয়ায়ে শাওয়াহেদুল ইবতেলাত এ বলেন,

কে ই বলদাহ্ কে নামশ্ চাটগাম আস্ত,
মক্বামে ফাজেলাঁ জি ইহ্‌তেশাম আস্ত।

ভাবার্থঃ এ শহরের নাম হল চট্টগ্রাম। তথায় অসংখ্য সম্মানিত অলি-আল্লাহ্‌র স্থান বা মাজার আছে।

ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) 'দিওয়ানে আজীজ' শরীফে বলেন,
দর ইরম আরামে গাহশ আ-কেঁ ইকরামশ কুনদ,
দর জাহান্নাম বুদে বাশ মুনকিরানে চাঁচগাম।

ভাবার্থঃ চট্টগ্রামের সম্মানকারীদের জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত। এর সম্মানের অস্বীকার কারীদের জন্য দোজখ। অর্থাৎ যারা মছলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে চট্টগ্রামের অসংখ্য অলি-আল্লাহ্ সহ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আমল ও কর্মপদ্ধতিকে মেনে চলবে তারা বেহেশ্‌তি, অন্যথায় এর বিপরীত।

পিতা-মাতা এবং শুভাগমনঃ তাঁর বুজুর্গ পিতার নাম আওলাদে রাসূল শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহ.)। তিনি নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বংশধর। মাতার নাম আবেদাহ জাহেদাহ, সৈয়দাহ বিবি খাইরুন্নেছা রহমতুল্লাহি আলাইহা। ১২৪৪ হিজরী, ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ঈসাব্দ, ১১৮৮ মঘি ১লা মাঘ, রোজ বুধবার জোহরের সময় গাউসুস্ সাকলাইন, ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) শুভাগমন করেন। তাই বাহরুল উলুম কাঞ্চনপুরী (রহ.) আয়নায়ে বারীতে বলেন,

আব তওয়াল্‌লুদ হোগেয়ে গাউসে খোদা,
ওয়াস্তে তা'জীম উনকে হো খাড়া।
জিসনে কি তা'জীম কু উন্‌কু ক্বিয়াম,
পা চুকা পাওরান ওয়াহী দিলকা মুরাম।

ভাবার্থঃ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর শুভাগমন হয়েছে, তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাও, যে তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান করেন, তিনি তার দিলের মনস্কাম পূরণ করতে সফল হন। তিনি আরো বলেন,

সাদ মারহাবা সাল্লি আলা গাউসে খোদা পয়দা হো'য়ে,
জানে জাহাঁ ওয়া ক্বেবলায়ে আহলে সফা পয়দা হো'য়ে।

ভাবার্থঃ পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টি বলছে মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা। আল্লাহ্‌র গাউস, পৃথিবীর প্রাণ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের ক্বেবলা বা ইমাম ভবে তাশরীফ এনেছেন।

শিক্ষাজীবনঃ পৃথিবীর অনেক কামিল অলি আল্লাহ্ ও ত্বরিকতের ইমাম আছেন যাঁদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যা ও লিখনী নাই, যেমন সৈয়দুনা হাবীবে আযমী (রহ.) যিনি হাবিবিয়া ত্বরিকার ইমাম, আর অনেকে মায়ের গর্ভ হতে মজজুবে মহজ অর্থাৎ সংসার বিমূখ অলি ছিলেন, কিন্তু মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমাম, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর বিপরীত। তাঁর বুজুর্গ পিতা তাঁকে চার বৎসর চারমাস বয়সে তৎকালীন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র মক্তবে পাঠান। ধারাবাহিকভাবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার সকল স্তর ভালভাবে পাশ করতঃ তৎসময় চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ১২৬০ হিজরীতে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে দীর্ঘ আট বৎসর ধারাবাহিকভাবে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১২৬৮ হিজরীতে দস্তান (পাগড়ী) গ্রহণ করেন। তাই তিনি পবিত্র হাদিস, তাফসীর, ফিক্বাহ্, উসুল, মানতিক, বালাগাত, ফছাহাত, হিকমত, আক্বাঈদ, ফলসফা, নাহু, সরফ সহ আরবী, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

কর্মজীবনঃ লেখা-পড়া শেষে তিনি ১২৬৯ হিজরী সনে যশোর জেলায় তৎকালীন বিচার বিভাগের সম্মানিত কাজী পদে নিয়োজিত হন। এ পদে এক বৎসর সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্‌র ইশারায় ১২৭০ হিজরীতে মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মাটিয়া বুরুজে মুন্সি বু-আলী (রহ.) মাদ্‌রাসায় বিজ্ঞ মুদার্‌রেস্

হিসাবে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে দীর্ঘদিন শিক্ষাদানের পর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বোচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় দক্ষ মুহাদ্দেসের প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন ওখানকার সবার বিশেষ অনুরোধে বু-আলী মাদ্‌রাসার দায়িত্ব ছেড়ে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দেস হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ সময় কলিকাতার চতুর্দিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় পাল্কিযোগে তাঁকে প্রায় সময় ধর্মীয় মাহফিলে নেওয়া হত।

ত্বরিকত জীবনঃ অনেকেই আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইমাম আলী মক্বাম, ইমাম হোসাইন (রাদ্বি.) প্রদত্ত ইসলাম ও ত্বরিকতের সঠিক ইতিহাস বিকৃত করে মানুষকে গোমরাহীর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। ইমামুত্‌ ত্বরিকত, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ত্বরিকতের পীর হচ্ছেন, ইমামুত ত্বরিকত গাউসুল আযম জিলানী (রাদ্বি.)'র বংশধর ও সেই ত্বরিকার মহান অলি শেখ সৈয়দ আবু শাহ্‌মা মুহাম্মদ সালেহ লাহুরী আল কাদেরী (রহ.)। এর উপর বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য লিখনী ১৯২৮ ঈসাব্দ হতে ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার পরও [ইতিহাস বিকৃতিকারীরা ১৯৬২ ঈসাব্দ হতে বিভিন্ন বই বাজারজাত করে চট্টগ্রামের সুফি নুর মুহাম্মদ নিজামপুরী সাহেব (রহ.) কে তাঁর পীর বলে আখ্যায়িত করে আসছেন। তথ্যটি সর্বোতভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। সম্মানিত পাঠক ও গবেষকের কাছে এ সমস্ত বিকৃত ইতিহাস সম্বলিত বই বর্জন করতঃ জাতিকে হেফাজতের দায়িত্ব নিজ কাঁধে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনৈক লিখক পীর-আউলিয়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তাঁর ত্বরিকত গ্রহণের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, তিনি নাকি ছাত্র জীবনে আবু শাহ্‌মা মুহাম্মদ সালেহ লাহুরী আল-কাদেরী (রহ.)'র খানকাহ্‌র বাইআত গ্রহণ করেন। ফয়েজ সহ্য করতে না পেরে হুগলি নদীতে পড়ে যান। কিছুদিন পর নাক্বেছ অবস্থায় নদী হতে উঠিয়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনরা বাড়িতে নিয়ে আসেন [না-উযুবিল্লা]। অথচ হুজুর সৈয়দুনা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মাদ্‌রাসা এ আলিয়ায় মুহাদ্দেস পদে শিক্ষকতা শুরু করেন। দুই বৎসরকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি হযরত শাহ্‌ সুফি আবু শাহ্‌মা সালেহ লাহুরী (রহ.) সাহেবের নিকট মুরীদ হয়ে বাতেনী (আধ্যাত্মিক) ইলম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। (বাংলাদেশের পীর-আউলিয়া, পৃষ্ঠা-১৩২ লিখক: এম. ওবাইদুল হক, ২য় সংস্করণ)। এর পরও তথ্য বিকৃতি করাকে আমরা নিন্দনীয় পরশ্রীকাতরতা হিসেবে মনে করি।

খিলাফত অর্জনঃ ত্বরিকত জগতে মুরিদ, পীর ও মুরাদ-এ তিন শব্দ খুবই পরিচিত। যিনি বাইআত হন তাঁকে মুরিদ, যিনি করান তাঁকে পীর ও মুরাদ বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর বিপরীতও হয়ে থাকে। অধিকাংশ মুরিদের মুরাদ হন নিজ পীর। কিন্তু পীরের অর্জিত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য তিনি তাঁর মুরাদকে খোঁজেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হলেন নিজ পীর হযরত আবু শাহ্‌মা মুহাম্মদ সালেহ লাহুরী (রহ.)'র মুরাদ। ওয়াজের

জন্য পাল্কিযোগে মাহফিলে যাওয়ার পথে হযরত আবু শাহ্মা লাহুরীর (রহ.) অন্যতম খলিফা শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব কর্তৃক সংবাদ পৌঁছিয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে খানকায় এনে তাঁর অর্জিত বেলায়তী শক্তি সাথে সাথে তাঁকে প্রদান করেন। তাঁর সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তাঁর পীর সাহেব কেবলা সম্পর্কে এবং তাঁর বেলায়ত অর্জনের ব্যাপারে কুরুচিকর মন্তব্য করে তাঁকে আল্লামা রুমী (রহ.)'র ভাষায় বলতে হয়–

গর খোদা খাহদ্ কে পরদাহ কছ্ দরদ্,
মাইলশ আন্দর তা'নায়ে পা'কা বরদ।

ভাবার্থঃ আল্লাহ্ যদি কারো দোষ (আইব) প্রকাশ করে দিতে চায়, পবিত্র ব্যক্তিদের গিবত করার দিকে তার ইচ্ছাকে ঝুঁকিয়ে দেয়।

শাদী মুবারক ও ওয়ারিসঃ বহু আউলিয়া কিরাম শাদী করেন নাই। কিন্তু মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১২৭৫ হিজরীর বৈশাখ মাসে ৩২ বছর বয়সে স্থানীয় আজিম নগর নিবাসী আওলাদে রাসূল মুন্সি সৈয়দ আফাজ উদ্দীন আহমদ এর কন্যা সৈয়দা আলফুন্নেসা সাহেবার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করার কারণেই সেই বৎসরেই একই গ্রামের সৈয়দ আফাজ উল্লাহ্ সাহেবের কন্যা সৈয়দা লুৎফুন্নেসার সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে ঘরে ১২৭৮ হিজরীতে সৈয়দা বদিউন্নেসা নামে এক কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেন। ৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। এর পর পর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, অল্পদিন পর তিনিও ইন্তিকাল করেন। পরে ১২৮২ হিজরীতে ১৩ই চৈত্র তারিখে সৈয়দ ফয়জুল হক জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১২৮৯ হিজরীতে তাঁর আর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যাঁর নাম সৈয়দা আনোয়ারুন্নেছা প্রকাশ 'তোতা ময়না'। তাঁর পুত্র সন্তান মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক হাটহাজারীর মির্জাপুর নিবাসী বড় মাওলানা মুফ্তিয়ে আযম সৈয়দ মসিহ্ উল্লাহ্ (ক.)'র মেয়েকে বিবাহ করতঃ দুই পুত্র সন্তান শাহ্ সুফি সৈয়দ মীর হাসান ও মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন কে রেখে গাউসুল আযম হযরত আকদসের পূর্বেই ১৯০২ সালে জান্নাতবাসী হন। হযরত গাউসুল আযমের ওফাতের ৪৩ দিনের মধ্যে বড় পৌত্র শাহ্ সুফি সৈয়দ মীর হাসান সাহেব জান্নাতবাসী হন। বর্তমানে তাঁর পুত্রের ঘরের একমাত্র নাতি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক ও দার্শনিক খাদেমুল ফোক্বারা সুলতানুল অলি শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর আওলাদগণই তাঁর ওয়ারিস।

শরীয়ত ও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাঃ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমাম হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর বংশানুক্রমে আওলাদগণ ও খলিফা এবং অনুসারীগণ শরীয়তের সুক্ষ্ম বিধি-বিধান পালনে খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন। যথাঃ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রায় বলতেন, "তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়, সালাতুত্ তাসবিহ্র নামায পড়, আইয়ামে বীজের রোজা রাখ, কবুতরের মত বাছিয়া খাও" ইত্যাদি। এ নীতির অনুশীলন ও চর্চা আজ

পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এখনো প্রতি বৃহস্পতিবার তাহাজ্জুদের নামায মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমাম গাউসুল আযম হযরত কেবলার দরবারে আওলাদে গাউসুল আযম সহ অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান ও জায়েরীন আদায় করেন। প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ আওলাদে কিরাম ও ভক্ত-মুরিদানরা আইয়ামে বীজের রোজা রাখেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতসহকারে গাউসুল আযমের মাজার শরীফসহ মাইজভাণ্ডার দরবারে বিভিন্ন মাজার শরীফে এবং খলিফাদের দরবারে আদায় হয়। এছাড়া দিন-রাত আশেক ভক্তরা, সালাতুত্ তাসবীহ ও অন্যান্য নফল নামায আদায় করতঃ শরীয়ত মতে গাউসুল আযম এর উসিলায় নিজ গুণাহ মাফ চেয়ে আল্লাহ্পাকের দরবারে কান্নাকাটি করেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত গ্রন্থ অষ্টম সংস্করণের ২৬ পৃষ্ঠায় 'বাল্যচরণ ও বিদ্যার্জন' শিরোনামে উল্লেখ আছে, সাত বৎসর বয়সের সময় তিনি নামায শিক্ষা করেন। তখন হতে তিনি মহাপ্রভুর উপাসনায় রত থাকতেন। রীতিমত তাঁর বাবার সাথে জামাতে নামায আদায় করতেন। নামাযের সময় হলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। নামায আদায় না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হতেন না। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বিখ্যাত গ্রন্থ আয়না-এ-বারীর শরীয়ত ও ত্বরিকত পরিচ্ছেদে আছে,

শরীয়তেরা রা মুকাদ্দাম দার আকনো,
ত্বরিকত আজ শরীয়ত নিস্ত বে-রোঁ।
ভাবার্থঃ ত্বরিকত শরীয়ত হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই শরীয়তকে সর্বদা অগ্রভাগে রাখতে হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও মাইজভাণ্ডার শরীফঃ কুরআন হাদীস, ইজমা ক্বিয়াস মতে ইসলামের মূলধারা আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরাই নাজাতপ্রাপ্ত। অত্র অঞ্চলে আউলিয়া ই কিরামের উসিলায় আমরা মুসলমান হয়েছি আর তাঁদের রুহানী প্রভাব ছাড়া যুগের ফিত্না ও যাবতীয় বাতিল মতবাদ হতে আমাদের ঈমান ও আমল ঠিক রাখা অসম্ভব। তাই আউলিয়া-ই-কিরামই আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বাঈদের সংরক্ষক ও প্রচারক। সুন্নি আক্বিদা ছাড়া শরীয়তের কোন আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর শরীয়ত পালন ছাড়া অলি-আল্লাহ্ হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। আর অলি-আল্লাহ্ হলে তিনি সুন্নি এবং শরীয়তের বিপরীত এটা বলা চরম বে-আদবী। তাই ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) বলেন, "মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ গেলে অলি-আল্লাহ্ হওয়া যায়।" অর্থাৎ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ বেলায়তের কারখানা [ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) জীবনী পৃষ্ঠাঃ ১২৭, ২য় সংস্করণ]। সুতরাং বেলায়তের কারখানায় প্রথম শর্ত সুন্নিয়তের কারখানা, দ্বিতীয় শর্ত শরীয়তের কারখানা। অতএব, সুন্নিয়ত ও শরীয়তের সমন্বয়ে ত্বরিকতের সফল কারখানা বিধায় মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ বেলায়তের কারখানা। তাই আজ জাতিসংঘসহ সারা বিশ্বে অন্যান্য ত্বরিকার মত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পীর মাশায়েখগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আদলে হেদায়তের কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এজন্য ইমাম শেরে বাংলা

(রহ.) দিওয়ানে আজীজ শরীফে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.)'র শুকরিয়া আদায় করে বলেন–

ব-মাইজভাণ্ডার শুদাহ আরামে গাহশ,
আজিজুল হক ব-জানো দিল ফেদায়শ।
ভাবার্থঃ মাইজভাণ্ডার দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আরাম করেন, আমি আজিজুল হক (ইমামে শেরে বাংলা) তাঁর দরবারে জানে-প্রাণে বিলীন। তৎকালীন বৃটিশ, বর্তমান বাংলাদেশের ভিন্ন আক্বীদার মৌলভী যখন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদার বিরুদ্ধে ফতোয়া লিখে প্রচার করে সুন্নিয়তকে বাধাগ্রস্থ করে দেন; তখনই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র নির্দেশে তাঁরই মহান খলিফা, মুফ্‌তিয়ে আযম, আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) তা খণ্ডন করে সুন্নি আক্বীদার প্রচার প্রসারে বহু ফত্‌ওয়ার কিতাব লিখেন। তৎমধ্যে একটি হল "শাওয়াহিদুল ইবতালাত ফী তারদীদে মা-ফি রাফিউর ইশকালাত" তাঁর শানে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) বলেন–

মৌলভী ফয়জুল্লাহরা দিল শুদ ছোঁ লালা দাগেদার,
বর খেলাফশ ছোঁ শাওয়া হেদ পেশে করদাহ নামে দার।
ইঁ হামা গুল হাজে বাগে আহলে সুন্নাত বে-গুমাঁ,
জুম্‌লা আলম্‌ কর্‌দ শায়দাহ বুয়ে ই গুল হা বেদাঁ।
নে'মতে উজ্‌মা বেলা শক বুদে বাহ্‌রে সুন্নিয়া,
জাহরে ক্বাতেল বুদে লেকিন আজ বরায়ে ওয়াহবিয়া।
ভাবার্থঃ মৌলভী ফয়জুল্লার অন্তর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, যখন ফরহাদাবাদী (রহ.) তাঁর বিপক্ষে শাওয়াহিদুল ইবত্বালাত লিখেন। হযরত ফরহাদাবাদী (রহ.) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাগানের স্বার্থক ফুল। এই ফুলের খুশ্‌বুতে সমগ্র জগতকে পাগল করে দেন। বিশ্বের মছলকে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর জন্য আল্লামা ফরহাদাবাদী বড় নেয়ামত। বিশ্বের বাতেলের জন্য প্রাণ নাশকারী বিষতুল্য। ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) আরো বলেন, তিনি **"হুজ্জাতুল খাল্‌ফ"** অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সুন্নিদের জন্য তাঁর ফতোয়া নিশ্চিত দলিল।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত কেবলা (ক.): নবুওয়াতের সময় নবীয়ে ছালাছার হেদায়ত ধারা যেরূপ শেষ নবীর "নবুওয়াতে মুহাম্মদীর" জাতে পাকে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ এই বেলায়তি ত্রিধারা ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর সময় গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ (ক.) এর জাতে পাকে বিকাশ লাভ করে। যার ফলে তিনি অতীত ধর্মাদি ও বিভিন্নমুখী বিক্ষিপ্ত ত্বরিকতসমূহের সমাবেশকারী। তাঁকে সকল ত্বরিকা অবলম্বনকারীদেরকে স্ব-স্ব ধর্মে ও ত্বরিকায় রেখে এবং নিজ বেলায়তের পদ্ধতি অনুযায়ী ফয়েজ বিতরণ করতে সমর্থ দেখা যায়। এই ত্বরিকায় আলেম, ওলামা, মুফ্‌তি, মুহাদ্দেস, লিখক, গবেষক আলোচক, পীর-মশায়েখ এযাবৎ আছেন ও কিয়ামত

পর্যন্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ্। অতএব, এ ত্বরিকার অনুসারীদের শাজরা শরীফের নাম **মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার শাজরা শরীফ**।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় বেলায়তে মোত্লাকার বিকাশঃ ইদানিং কোন কোন ব্যক্তি বলেন, বেলায়তের শ্রেণী বিভাগে 'মোত্লাকা' ও মুকাইয়েদা কোন শব্দ নাই। তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.), (আওলাদে রাসূল, হুযুর সৈয়দুনা অছি-এ-গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত) "বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থে ১৩/৯/১৯৬৮ ঈসাব্দে অভিমত প্রদানে বলেন– "আমি আশা করি এই কিতাবটি উচ্চ শ্রেণীর ত্বরিকতপন্থীর জন্য বিশেষ উপকারে আসবে। আল্লাহ্ তায়ালা রচনাকারীকে দ্বীন ও দুনিয়ার শান্তি ও ইজ্জত দান করুন। আমিন।" (ফকির সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী)।

ইমাম শেরে বাংলা আলকাদেরী (রহ.)'র উপরের অভিমত হতে আমরা বুঝে নিতে পারি যে, ত্বরিকতের উচ্চ জ্ঞান ব্যতীত নফ্সে আম্মারা স্তরের ব্যক্তিবর্গের জন্য এই "বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থ কোন উপকার হবে না, যেমন, আবু জাহেল গং এর জন্য আমাদের নবী ও পবিত্র কুরআন মাজীদ কোন উপকারে আসে নি। ১০৪৫ হিজরী সনে হযরত খাজা আব্দুর রহমান চিশ্তী সাবেরী (রহ.) লিখিত হযরত ওয়াহেদ বুখ্শ যিয়াল চিশ্তী সাবেরী উর্দু অনুদিত "মির আতুল আসরার" নামক গ্রন্থের সূচিতে বেলায়তে মুকাইয়েদাহ্ ও মোত্লাকার উপর পৃথক পরিচ্ছেদ আছে এবং ১২২ পৃষ্ঠায় এর পরিস্কার বর্ণনা আছে। শেখুল আরেফীন হযরত নেজাম ইয়ামেনি (রহ.) রচিত মাওলানা সৈয়দ হাকিম আব্দুল হাই আল আশরাফী আল জিলানী (রহ.) উর্দু অনুদিত লতায়েফে আশরাফীর ১ম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় বেলায়তের প্রকার ভেদে বেলায়তে মোত্লাকা ও মোকাইয়েদার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এটাও সত্য যে সমস্ত দ্বীন বা আদইয়ানের মূল উদ্দেশ্য তাওহীদ, (আল্লাহ্ এক) যাকে শরীয়ত ও ত্বরিকতের পরিভাষায় আরবীতে **"তাওহীদে আদইয়ান"** বলা হয় যা আমাদের ঈমান যথাঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা ইকাতিহি ওয়াকুতুবিহি ওয়ারুসুলিহি...। অতএব বেলায়তে মোত্লাকা, মুকাইয়াদা, তাওহীদে আদইয়ান ইত্যাদি সম্পর্কে ইলমে ত্বরিকত ব্যতীত ধারণা অর্জন সম্ভব নয়।

ইমামুত ত্বরিকত, আওলাদে রাসূল, **গাউসুল আযম, মুহিউদ্দীন সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.)** এর যুগ ছিল বেলায়তে মোকাইয়াদার অর্থাৎ– ইসলামী হুকুম আহকামের বিধান জারী করার অনুকুল যুগ। তৎসময়ে এ কাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন বাধা ছিল না, বরং পক্ষেই ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সমস্ত পাপ কার্যের জন্য শরীয়তে "দুর্‌রা" মারার নির্দেশ আছে তা মারার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন বাধা ছিলনা বিধায় তা সাথে সাথে জারী করতে পেরেছেন অথচ বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এর বিপরীত। বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের গাউসুল আযম পীরানে পীর দস্তগীর (ক.) হতে প্রায় ছয়শত (বর্তমানে আটশত) বৎসরাধিক দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের দরুন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে ধর্মীয় যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় বিশ্ব ইসলামী ইমারতে পুনরায় ভাঙ্গন ধরে এবং শরীয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৭৬০ ঈসাব্দে ১৪ অক্টোবর তারিখে এদেশে ইংরেজ (খ্রিস্টানের) হুকুমত প্রতিষ্ঠার ফলে মুহাম্মদী দ্বীন-রবির দ্বিপ্রহরের সময় মানবকুল পুনরায় অন্ধকারে পতিত হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে। যেহেতু সামাজিক আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্য হারা মুসলিম সমাজের ব্যবস্থা দিন দিন অচল ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, সেহেতু এ প্রাণহীন দুর্বল শরীয়তী ব্যবস্থার যুগে নৈতিক ধর্ম প্রধান বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকতা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে বেলায়ত; বিধান ধর্ম ও রেওয়াজ থেকে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়, সে বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকা যুগের আরম্ভকারী ধর্ম-সাম্য বা **তাওহীদে আদ্বীয়ানের সমর্থক যা আমাদের ঈমান**।

এ যুগে স্পেশাল ধর্ম মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রী ও ধর্মীয় শিক্ষা বোর্ড থাকা সত্ত্বেও আটশত বৎসর পূর্বের চেয়ে অসংখ্য পাপকার্য বেড়ে চলার পরও আলেম-ওলামা, মুফ্‌তি ও পীর মশায়েখগণ শরীয়তী হুকুম জারি করতে পারছেন না, অন্যদিকে তারা শরীয়তের আইন জারি করতে না পেরে দেশও ত্যাগ করছেন না। কারণ সমগ্র বিশ্বে প্রায় এ অবস্থা। তাই সারা বিশ্বে বেলায়তে মোত্‌লাকার আওয়াজ, তাওহীদে আদ্বীয়ানের ঢংকা-বাজছে। যেই তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট রুহী জগতে রুহীভাবে "আলাস্‌তু বিরাব্‌বিকুম ক্বালু বালা" (অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু? সমগ্র আত্মা বলেছিলেন হ্যাঁ!) বলে ঈমান এনেছিলাম, যা ভুলে গিয়ে আজ বিবাদে লিপ্ত, অসংখ্য মতবাদের কারণে আমরা এক স্রষ্টার স্মরণ ত্যাগ করে একে অপরের বিপক্ষে দাঁড়াতে ব্যস্ত। স্রষ্টাবিমুখ বিশ্বমানবকে স্রষ্টার প্রতি আহ্বান করার জন্য গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা' "প্রবর্তন করে উসুলে সাব'য়ার মাধ্যমে নাস্তিকতাবাদের আওতা হতে সঠিক, সহজ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাবধারা মতে তাওহীদের (এক স্রষ্টার) প্রতি আহ্বান করেন। তাই কবির কণ্ঠে শোনা যায়,

* গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী,
তাওহীদের কাণ্ডারী।
* মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তাওহীদের নিশানা।
ঘুমাইওনা মায়া ঘুমে আখের জামানা,
* গাউসে আযম আঁ শাহে মাইজভাণ্ডারী,
আঁ চেরাগে উম্মাতানে আহমদী।
* মাজহারে আস্‌রারে কুদরত গাউসে আযম আঁপহে,
* আয়না-এ-আনওয়ারে ওয়াহ্‌দাত গাউসে আযম আঁপহে।

বেলায়তে ওজমা ও বেয়াদবীর শাস্তি: মানব যখন বেলায়তের সর্ব উচ্চ মক্বাম গাউসে আজমিয়তের আসনে আসীন হন, তখন সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই অনুগত হয়, তিনিই আল্লাহ্‌র হুকুমে সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও গাউসুল আযম পীরানে পীর

দস্তগীর (ক.) উক্ত মক্বামের অলি আল্লাহ্। তাই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী নিজেই বলেন– "আমি হাশরের দিন প্রথম বলব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর দুইটি টুপির মধ্যে একটি টুপি আমার মাথায়, অপরটি আমার ভাই বড়পীর সাহেবের মাথায় দিয়েছেন।" "আমি মক্কা শরীফে গিয়ে দেখলাম রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদর মোবারক (বক্ষস্থল) এক অনন্ত দরিয়া; আমি এবং আমার ভাই পীরানে পীর সাহেব ঐ দরিয়াতে ডুব দিলাম" (বেলায়তে মোত্লাকা)। গাউসুল আযম জিলানী (ক.) গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উপরোক্ত বাণীর সমর্থনে বলেন, "আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে"। বিস্তারিত বৈরুত লেবানন হতে প্রকাশিত বাহজাতুল আসরার ৫৫ পৃঃ পড়ার অনুরোধ রইল। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ভাই কুতুবুল ইরশাদ মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল আল মাইজভাণ্ডারী (রহ.)'র শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ (রহ.) একদা রাত্রিকালে তাঁকে (গাউসুল আযম) কবর স্থানে দেখতে পেয়ে বাড়িতে চলে আসতে বলার উত্তরে তিনি বলেন, "মুর্দ্দারা এখানে আর্তনাদ করছে, তাই এসেছি। আপনি চলে যান, জ্বীন, পরী, সর্প, বাঘ আমার অনিষ্ট করবে না, তারা আমার অনুগত।" এটা তাঁর গাউসে আজমীয়ত বা বেলায়তে উজমার পরিচায়ক [বেলায়তে মোত্লাকা]।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সময় সময় বলতেন "আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে।" এটা কুরআন পাকের সূরা "আলাম নাস্‌রাহ লাকা" এর বার মঞ্জিলের ইঙ্গিতবাহী, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বার মঞ্জিলের অনুরূপ। এটা জিল্লে মুহাম্মদীর পরিচায়ক। সময়ে সময়ে আরও বলতেন, "তুমি আমার সামনে থেকেও যদি স্মরণ বিচ্যুত হও তা হলে তুমি তখন ইয়ামেন দেশের বাসিন্দা; কিন্তু স্মরণ অবস্থায় তুমি যেখানেই থাকনা কেন তুমি আমার সামনে।" মাইজভাণ্ডার শরীফ যাওয়ার পূর্বে ধুরুং খালের প্রতি তাঁর "দূর হও" বাণীতে তাঁর ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হয়ে হঠাৎ তার স্রোত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাসাওউফের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলে যিনি "হয়ে যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয় সংঘটিত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, "যে কেউ আমার (গাউসিয়তের) সাহায্য প্রার্থনা করবে, আমি তাকে উম্মুক্ত সাহায্য করব। আমার (গাউসিয়তের) সরকারের এ রীতি হাশর পর্যন্ত জারি থাকবে।" ইত্যাদি বাণীর বাস্তবতা তাঁর পবিত্র জীবদ্দশা হতে শুরু করে এখনো জারি আছে। এই শক্তির অধিকারী সম্পন্ন অলি-আল্লাহ্‌কে সুফি পরিভাষায় "গাউসুল আযম" বলে। গাউসুল আযমের সাথে বেয়াদবী করলে বেআদবীর অবস্থা অনুযায়ী শাস্তি হয়। যেমন, ফটিকছড়ি থানার শাহনগর গ্রামের বাহারুল্লাহ শাহ ও বগুড়ার এক প্রখ্যাত অলি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে বে-আদবী করার দরুণ শাস্তি স্বরূপ তাঁদের বেলায়ত ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায়। (জীবনী ও আয়না এ বারী দ্রঃ)। এজন্য বাহরুল উলুম মুফ্তী কাঞ্চনপুরী মাইজভাণ্ডারী (রহ.) বলেন–

গাউসে আযম আউলিয়া কা সর ওয়ারো সরদার হে,
গাউসে আযম মালিকে কুল-ই-জদী সরকার হে।

ভাবার্থঃ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী অলিদের সরদার হেতু তিনি আল্লাহ্পাকের ইচ্ছায় সবকিছুর মালিক।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডারী (রহ.) বলেন–
কুরবতে উ কুরবতে রাব্বুল বাশার,
দুরী আজ ইযদ্ যে দুরি য়শ্ শুমার।
ওয়াজ্ হুহু মিছলুল মির আতি লিল ওয়ারা,
ফিহি ওয়াজ হুল্লাহি তা'আলা ইয়ারা।

ভাবার্থঃ তাঁর নৈকট্য আল্লাহ্র নৈকট্য। তাঁর থেকে দূরত্ব আল্লাহ্রই দুরত্ব। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল সৃষ্টির জন্য দর্পণতুল্য যেখানে আল্লাহ্র কুদরতির চেহারা দেখা যায়। মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী মাইজভাণ্ডারী (রহ.) "বিষাদ তরঙ্গে" বলেন,

কেন চিনলিনারে মন,
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা কেমন।
নৈরূপ আকার নিল, ছলে জগৎ মাতাইল,
নর-নারী হুর ফেরেস্তা প্রেমেতে মগন্। ঐ
আকাশ পাতাল আর, দেব দেবতা তাবেদার,
যাঁহার হুকুমে চলে এই ত্রিভুবন। ঐ
নি লক্ষ্যতে লক্ষ্য করি জ্ঞান পথে ধ্যান ধরি,
প্রেমের প্রদীপ হাতে কর নিরীক্ষণ। ঐ
কোরানে কয় চিনতে তাঁরে
সৃষ্টি তোদের এই সংসারে,
না চিনিয়া মরিয়া গেলে বিফল জীবন। ঐ
চিন্তে পারে সাধ্যকার, চিনিবার ইচ্ছা যার,
হৃদয় চক্ষে ধরিয়া দেখ, জ্ঞান দুর্বীক্ষণ। ঐ
স্বার্থ যত ত্যাগ করি করিমের কথা ধরি,
অবিরত মওলা নাম করহ জপন। ঐ

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার খলিফাদের তালিকাঃ বেলায়তে মুকাইয়াদার ধারক ও বাহক ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আযম জিলানীর অসংখ্য খলিফা ছিলেন ও বংশ পরম্পরায় আছেন যাঁরা কাদেরীয়া ত্বরিকার মাধ্যমে বিশ্বে দ্বীন ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। একইভাবে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমাম বেলায়তে মোত্লাকার ধারক-বাহক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অসংখ্য খলিফা ছিলেন ও বংশ পরম্পরায় আছেন যাঁরা বিশ্বে দ্বীন ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। তাঁদের সংখ্যা নিরূপণ করা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ ব্যাপারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কালাম করেন, "হারামে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ফেরেস্তে হেঁ।"

ভাবার্থঃ গাউসুল আযম এর এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ফেরেশ্‌তাতুল্য প্রতিনিধি আছেন (আয়না-এ-বারী)। তবুও নমুনা স্বরূপ তিপ্পান্ন জন সুপরিচিত স্মৃতিধারী অলি-আল্লাহ্‌দের তালিকা 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এরপর আরো আটজন পবিত্র নাম আছে, যারা হযরত আকদসের পর গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) হতে কামালিয়ত অর্জন করেন। অন্যদিকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শতবর্ষের আলোকে গ্রন্থে সর্বমোট **১৬২** জনের পবিত্র নাম উল্লেখ আছে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কারামতঃ যিনি বেলায়তে ওজমার অধিকারী অলি-আল্লাহ্‌ হন তাঁর প্রতিটা কর্মই কারামত। কারণ তিনি বিশ্বব্যাপি রূহানীভাবে বিশ্ব ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বের সমস্যা সমাধান করেন। এটা জাগতিকভাবে বর্ণনা করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তবুও সংক্ষেপে কয়েকটি কারামতের শিরোনাম উল্লেখ করলাম। হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত ও মুদার্‌রিস নিযুক্ত, হযরতের প্রভাবে নাজিরহাট আহমদিয়া মাদ্‌রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন, হযরতের প্রভাবে সাগর ডুবি হতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার, মহাজেরে মক্কির সালামের উত্তরদানে অলৌকিক কারামত প্রদর্শন ও সালাম প্রেরণ, কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার মাওলানা জনাব সফিউল্লাহ্‌ সাহেব মারফত হযরতের পরিচয়, মেয়ে লোকের প্রতি হযরতের ফয়েজ রহমত এবং বেহেশ্‌ত ও মন্‌কির নকির সম্পর্কে তাঁর তাছার্‌রোপাত, হযরতের অনুগ্রহে আকরাম আলী চৌধুরীর সন্তান লাভ, তাবার্‌রুক মারফত সন্তান দান, সাগর জলে হযরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন, সাগর গর্ভেও হযরতের প্রভাব এবং শাহ্‌ কুলজামের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের নিদর্শন, হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাগমন, আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়িতে থেকে মক্কা মদীনা সায়ের, হযরতের বেলায়তি ক্ষমতায় বাহুতে হাত রেখে জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন, সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব, হযরতের প্রতি বাঘের আনুগত্য, হযরতের অপূর্ব কারামত বাঘের কবল হতে প্রাণ রক্ষা, হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘের মুখে লোটা নিক্ষেপে ভক্ত উদ্ধার, হযরতের যষ্টির প্রহারে ফয়েজ রহমত দান ও মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার, হযরতের বেলায়তি প্রভাবে পূণর্জীবন প্রাপ্তি, হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ, হযরতের বেলায়তি প্রভাবে মৃত্যুকালে আজরাঈল ফেরৎ ও ষাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি, মৃত্যুকালে দর্শনদানে ঈমান রক্ষা, হযরতের আদেশে রেয়াজ উদ্দীন উকিলের ভূ-সম্পত্তি খরিদ ও রেয়াজ উদ্দীন বাজারের পত্তন, হযরতের আশ্চর্য্য কারামতে বোগলের নিচে কাবা শরীফে মুসল্লী প্রবেশ করতে দেখতে পান, ৫৯ মঘির প্রলয়ঙ্করী বড় তুফানের ভবিষ্যৎ বাণী, ওফাতের পরে হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শন দান, হযরত স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হতে নিরাপদ রাখার আভাস ও অভয়দান, হযরতের প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ, এ ব্যাপারে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)'র এ মন্তব্যই যথেষ্ট–

কেরামাতশ বেরো আজ হদ্দে শুমার আস্ত,
বছা নাক্বেছ যে ফায়যশ পুর কামাল আস্ত।
খোদা ওয়ান্দা ব-হক্বে গাউসুল আযম,
আজিজশরা বদেহ ইজ্জে দো আলম।

ভাবার্থঃ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কারামত অসীম। তাঁর বেলায়তি প্রভাবে অসংখ্য নাকেছ ব্যক্তি কামিল অলি-আল্লাহ্ হয়েছেন। হে আল্লাহ্! গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর উসিলায় তাঁর আজিজ (শেরে বাংলা)কে উভয় জগতে ইজ্জত দান করুন। (দেওয়ানে আজিজ শরীফ ৪০ পৃষ্ঠাঃ ২য় প্রকাশ)

শাজ্‌রা শরীফ

(১) ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, (২) আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা (রাদ্বি.), (৩) সৈয়দুস্ শোহাদা হযরত ইমাম হোসাইন (রাদ্বি.) (৪) সৈয়দুস সালেকীন হযরত সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (রাদ্বি.), (৫) সৈয়দুল ওয়াসেলীন হযরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাদ্বি.), (৬) সৈয়দুল কামিলীন হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদ্বি.). (৭) সৈয়দুল আলম হযরত ইমাম মুসা কাজেম (রাদ্বি), (৮) সৈয়দুস সাকলাইন হযরত ইমাম আলী ইবনে মুসা রেজা (রাদ্বি.), (৯) সৈয়দুল ওয়াসেলীন হযরত শেখ মারুফ করখী (ক.), (১০) সোলতানুল মাহবুবীন হযরত সির্‌রে সকতী (ক.), (১১) সৈয়দুল আসফীয়া হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (ক.), (১২) সোলতানুল আউলিয়া হযরত আবু বকর শিবলী (ক.), (১৩) মাহবুবুস্ সালেকীন হযরত শেখ আব্দুল আজিজ তমিমী (ক.), (১৪) ইমামুল কামিলীন হযরত আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ তমিমী (ক.), (১৫) সৈয়দুল আউলিয়া হযরত মৌলানা আবুল ফরাদ ইউসুফ তরতুসী (ক.), (১৬) সৈয়দুস সাকলাইন হযরত মৌলানা আবুল হাসান কুরআনশী (ক.), (১৭) শেখুল মশায়েখ হযরত আবু সাঈদ মখজুমী (ক.), (১৮) কুতুবুল আলম গাউসুল আযম ইমামুত ত্বরিকত হযরত সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাদ্বি.), (১৯) সোলতানুল আরিফীন হযরত শাহাবুদ্দিন সরওয়ার্দি (ক.), (২০) সৈয়দুল আরিফীন হযরত নেজাম উদ্দিন গজনবী (ক.), (২১) হযরত সুফিউল আসফীয়া সৈয়দ মোবারক গজনবী (ক.), (২২) হাদীউল আশেকীন হযরত সুফি নাজমুদ্দিন গজনবী (ক.), (২৩) সোলতানুল মাহবুবীন হযরত সুফি কুতুব উদ্দিন রওশন জমির (ক.), (২৪) হাজী ইলাল্লাহ্ হযরত সুফি ফজলুল্লাহ্ (ক.), (২৫) জোবদাতুল কামিলীন হযরত সৈয়দ মাহমুদ (ক.), (২৬) সোলতানুল মোকাররেবিন হযরত নাছিরুদ্দিন (ক.), (২৭) ইমামুল মশায়েখ হযরত সুফি নেজামুদ্দিন (ক.), (২৮) মকসুদুত্তালেবীন হযরত সুফি নেজামউদ্দীন (ক.), (২৯) সৈয়দুল আরিফীন হযরত সৈয়দ আবদুল্লাহ্ (ক.), (৩০) কোদ্‌ওয়াতুস্ সালেকীন হযরত সৈয়দ জাফর হোসাইন (ক.), (৩১) মতলুবুত্তাবেলীন হযরত সুফি খলিলুদ্দিন (ক.), (৩২) কুতুবুল আকতাব হযরত মৌলানা মুহাম্মদ মোনয়েম (ক.), (৩৩) ইমামে হাইউল ক্বাইয়ুম হযরত সুফি মুহাম্মদ দায়েম (ক.), (৩৪) মোতাওয়াক্কেল আলাল্লাহ, হযরত সুফি

আহমদ উল্লাহ্ (ক.), (৩৫) হাদী ইলাল্লাহ্ হযরত হাজী সুফি লকিতুল্লাহ (ক.), (৩৬) হাজীউল হারামাইন গাউসে জমান হযরত সুফি সৈয়দ আবু শাহ্মা মুহাম্মদ সালেহ লাহুরী (ক.), (৩৭) কুতুবুল আফখম গাউসুল আযম সোলতানুল আরিফীন রুহুল আশেকীন মুরাদুল মোশতাকীন খাতেমুল আউলিয়া ইমামুত ত্বরিকত হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

বেসাল শরীফ ও জানাযাঃ ১৯০৬ ঈসাব্দের ১৩২৩ হিজরীর ও ১৩১৩ বাংলার ১০ মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলক্বদ সোমবার দিবাগত রাত একটার সময় একমাত্র মাহবুব মহান আল্লাহ্র শুভ মিলনে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বেসাল হন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। পরদিন মঙ্গলবার দিবাশেষে বাদ আসর হযরত আকদসের বেয়াই, পীর ভাই ও ভক্ত বাহরুল উলুম, মুফ্তীয়ে আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ মসিহ্ উল্লাহ্ মির্জাপুরী (ক.) সাহেবের ইমামতিতে জানাযা সমাপন হয়।

উরস শরিফ ও মহাসম্মেলনঃ প্রতি বৎসর ১০ মাঘ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, বেলায়তে মোত্লাকার দ্বার উন্মোচক, ধর্মসাম্যের (তাওহীদে আদইয়ানের) আহ্বানকারী, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র উরস শরিফ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে রূহানী জগতের এক মহান সম্মেলন হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। জনসমাগমে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম সম্মেলন সমূহের মধ্যে পঞ্চম।

মাহবুবে এলাহী, ইউসুফে সানী, গুলে গোলাব গাউসুল আযম-বিল-বিরাসত হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কা'বা (ক.)

মুফতি আবুল ফজল মুহাম্মদ ছাইফুল্লাহ্ সুলতানপুরী মাইজভাণ্ডারী

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আত্মপরিচয় দানের জন্য নিজ জাতি নূর হতে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে সৃষ্টি করেন। অশেষ দরূদ সালাম নূর নবী রাহমাতুল্‌লিল আলামীনের উপর ও তাঁর বংশ, সাহাবী এবং আউলিয়া-ই- কিরামের উপর যাঁরা আল্লাহ্‌র মনোনীত সমস্ত নবী রাসূলের প্রচারিত তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ শরীয়ত ও সুফিদের পরিভাষায় যাকে তাওহীদে আদ্বীয়ান বলে) কে প্রচার করার জন্য নিজ জীবনকে বিলীন করে দেন।

বংশ পরিচিতি

একষট্টি হিজরীতে কারবালার প্রান্তরে আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণ পার্থিব ক্ষমতার লোভী ইয়াজিদ ও তার সৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন এবং আল্লাহ্‌র মর্জিতে হুজুর সৈয়দুনা ইমাম জয়নাল আবেদীন (রাদ্বি.) জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় তাঁরই আওলাদ সৈয়দ বংশ হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তার করতঃ ইসলাম প্রচারের খেদমতে অদ্যাবধি নিয়োজিত। উক্ত সৈয়দ পরিবারের কাজী সৈয়দ হামিদুদ্দীন শাহ্ (রহ.) গৌড় নগর হয়ে ১৫৭৫ ঈসাব্দে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালায় বসতি স্থাপন করেন, বর্তমানে এটা হাইদগাঁও নামে পরিচিত। তাঁর বংশের মধ্যে সৈয়দ আব্দুল কাদের শাহ্ অন্যতম। তাঁরই [সৈয়দ হামিদুদ্দীন গৌড়ী শাহ্ (রহ.)] অধঃস্তন ৫ম বংশধর হলেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক, গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী বিন মাওলানা সৈয়দ মতি উল্লাহ্ শাহ্ (রহ.)। আর ষষ্ঠতম বংশধর হলেন গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা সৈয়দ গোলাম রহমান মাইজভাণ্ডারী বিন মাওলানা সৈয়দ আব্দুল করিম শাহ্ (রহ.) এবং কুতুবুল ইরশাদ মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল বিন মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ শাহ্ (রহ.)।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২৮৪ হিজরীর ১২ জমাদিউস সানী-১২৭০ বাংলার ২৭ আশ্বিন সোমবার মাইজভাণ্ডার দরবারে তাঁর শুভ জন্ম হয়। এ ব্যাপারে আশেকরা বলেন–

"গম্ নেহী আউর ফিকরে নেহী আজ উম্মত মুহাম্মদ কে লিয়ে,
ইছমে রাহমান কা মুজাছ্ছাম্ গাউসে রহমান পয়দা হুয়ে।"

ভাবার্থ

বিপদগ্রস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কোন পেরেশানি ও চিন্তা নাই। তাঁদের জন্য বেলায়তে মোত্লাকার অর্থাৎ উম্মুক্ত বেলায়ত শক্তির দয়াদৃষ্টি দানকারী গাউসুল আযম বিল বিরাসত গোলাম রহমান ভবে এসেছেন। পরে যখন নিজ পিতা সুবাসিত কাপড় জড়িয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলার কোলে তুলে দেন, সাথে সাথে হযরত কেবলা নূরানী জবানে কালাম করলেন, "ইয়ে হামারে বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) কা চেহারা ইস্মে আয়া হ্যায়, উস্কু আজিজ রাখহো, মাইনে উস্কা নাম গোলাম রহমান রাখহা" অর্থাৎ এই শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউসুফ (আ.) এর নুরানী রূপ তাঁর মধ্যে বিকশিত। তাঁকে যত্ন করবে। আমি তাঁর নাম গোলাম রহমান রাখলাম। (অলিকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী গ্রন্থের ২০ ও ২১ পৃঃ)।

তাই ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) তাঁর শানে বলেন,

ইউসুফে সানী বেলাশক বুদে দর আখের জঁমা,

মাজ্হারে নূরে খোদা উরা ব-দানী বেগুমাঁ।

ভাবার্থ

গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী সন্দেহ ছাড়া শেষ যুগের দ্বিতীয় ইউসুফ। তাঁকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নূরের বিকাশস্থল বলে মনে কর।

ছাত্র জীবন ও শাদী মোবারক

শিশু অবস্থায় যখন পড়ার উপযোগী হয়ে উঠেন তখন নিজ পিতা ভাল কাপড় ও টুপি পরিয়ে জুমাবারে প্রথম সবক্ব (পাঠদানের জন্য) দেওয়ার জন্য হযরত গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) এর খেদমতে নিয়ে যান। হযরত কেবলা তাঁকে শিক্ষার্থী বেশে দেখে একটু মুচকী হাসলেন এবং বললেন, "তুমি কালামুল্লাহ (আল্লাহ্র বাণী) পড়বে, আচ্ছা পড় দেখি"-এ বলে তিনি পবিত্র কুরআনের সবক্ব দেন। এভাবে তিনি দক্ষতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পনের বৎসর বয়সে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বাবুনগর নিবাসী মাওলানা মোবারক আলীর সাথে ১২৯৯ হিজরী সনে উচ্চ শিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম শহরের তৎকালীন মসলকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মারকাজ সরকারী মুহসেনিয়া মাদ্রাসায় (এ-মাদ্রাসা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তি প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত) ভর্তি হন। এখানে দুই বৎসর সুনামের সাথে লেখাপড়া করেন। সম্মানিত উস্তাদ মাওলানা মোবারক আলী সাহেব তৎসময় ফটিকছড়ি বাজার মসজিদ সংলগ্ন দরসে নেজামীর আদলে মাদ্রাসা স্থাপন করে তথায় শিক্ষকতার জন্য নিজেই চলে আসেন। সাথে তাঁর স্নেহের ছাত্র, জগতের প্রিয় বাবাজান কেবলাও চলে আসেন এবং তিন বৎসর দক্ষতার সাথে লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে এ মাদ্রাসা বিলুপ্ত হওয়ার দরুণ পুনরায় ১৩০৪ হিজরীতে সরকারী মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এভাবে তিনি প্রতি জামাতে কৃতিত্বের সাথে পাস করে জামাতে দুয়ামে

উঠেন। এ সময়ে তিনি প্রায় ভাব-বিভোর অবস্থায় থাকতেন। বাড়িতে আসলে গাউসুল আযম হযরত কেবলার নূরানী পা দ্বয় জড়িয়ে ধরা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতেন না। তাঁর পা মোবারক হতে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে অনেক কষ্ট হত। তেইশ বৎসর বয়সেও সংসারের প্রতি একেবারে উদাসীন হওয়ায় পরিবারের সবাই পরামর্শ করে তাঁর শাদী মোবারকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্‌র হুকুমে ১৩০৭ হিজরী সনে ১২৫২ মঘির ২৭ ফাল্গুন ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত সুয়াবিল নিবাসী আওলাদে রাসূল হযরত সৈয়দ কমর চাঁদ শাহের বংশধর আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ আলি আল হোসাইনি সাহেবের প্রথমা কন্যা সৈয়দা জেবুন্নেসা বেগমের সাথে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপরও তিনি সংসারের প্রতি স্বাভাবিক হন নি। ধারাবাহিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি জামাতে উলার ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে দোয়ার জন্য বাড়িতে আসলে সকলের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে পরিশেষে বাবাজানের নিজ ছোট ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম গাউসুল আযম হযরত কেবলার নিকট বিনীতভাবে আবেদন করেন– হুজুর, মেঝ ভাই জামায়াতে উলার পরীক্ষা দিতে যাবেন। আপনার দোয়া ও হুকুমের অপেক্ষায় আছেন, উত্তরে হযরত কেবলা বলেন, “হাঁ বাচা, তাঁর পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমি তাঁকে নাজিরহাট আশরাফ আলী খলিফার দোকানে খেয়ে মসজিদে থাকতে বলি।” পরবর্তীতে শহরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, রীতিমত দুই দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর তৃতীয় দিনে পরীক্ষার হলে তাঁর খোদায়ী প্রেমের জজবা অধিক হওয়ায় কাগজ কলম দূরে নিক্ষেপ করে জজ্‌বা হালে অনেক রাজ রহস্যের গজল পড়তে লাগলেন, অবশেষে তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার পর হযরত কেবলা তাঁকে নিজ মোবারক হাতে এক গ্লাস শরবত পান করান। এরপর তাঁর প্রেম নেশা নিয়ন্ত্রিত হলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিয়ে আসেন। এরপর তাঁকে লেখা পড়ার কথা বললে তিনি বলতেন,

আইছুহাল্ ক্বাওমুল্লাহী ফিল মাদ্‌রাসাহ,
কুল্লামা হাস্‌সাল তুমুহা ওয়াছ্ ওয়াছা।
সদ্ কিতাবো ওরারকহা দর নারকুন,
রুয়ে খোদ্‌রা জানেবে দিল দারে কুন।

ভাবার্থ

হে মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্রগণ! তোমরা যা কিছু লাভ করেছ তা সব তোমাদিগকে ধাঁধায় ফেলছে। শত কিতাব ও পত্রাবলী অগ্নিতে নিক্ষেপ কর এবং প্রিয়তমের প্রিয় আননেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ কর।

ত্বরিকত ও খেলাফত লাভ

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রুহানী শক্তিতে খিজরী ও বেলায়তে মোত্‌লাকার (যা স্বাভাবিক নিয়মে বুঝে আসে না) প্রভাব বেশী, তাই বেলায়তে মুকাইয়াদার ‘ত্বরিকা মতে জনসাধারণ প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর কর্ম পদ্ধতি বুঝে নিতে অক্ষম। পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আ.) ও খিজির (আ.) এর ঘটনা এর উত্তম উদাহরণ। অনেক সময় পীর ও মুরিদের মধ্যে সম্পর্ক

সৃষ্টির জন্য পীরের হাতে হাত রেখে বাইআত হওয়া শর্ত নয়। শুধু পীরের সংশ্রব বা অন্য কোন প্রকারে পীর মুরিদকে গ্রহণ করলে এই ব্যাপারে যথেষ্ট। যদিওবা বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট অন্য পন্থা অর্থাৎ হাতে হাত রেখে বাইআত হওয়াও পরিলক্ষিত হয়। (বিস্তারিত ফরহাদাবাদী (রহ.) রচিত ফত্ওয়া এ তোহফাতুল আখ্ইয়ার দ্রষ্টব্য)

অতএব, উল্লেখিত মত অনুযায়ী হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমও জন্মের পর হতে মক্কা শরীফের পূর্ব অঞ্চলে (গাউসুল আযম জিলানীর মত) বিকশিত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সান্নিধ্যে ছিলেন। আর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীও তাঁকে নিজ রুহানী বাগানের শ্রেষ্ঠ ফুল হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই তাঁর ত্বরিকত ও খেলাফতের ইতিহাস। 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় হযরতের নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবাজান কেবলার প্রতি ফয়েজ বর্ষণ ও খেলাফত স্বীকৃতি শিরোনামে খেলাফতের বর্ণনা আছে। অলিকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় খেলাফতের বিষয় এভাবে বর্ণনা আছে অর্থাৎ বাবাজান কেবলার ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ হাসেম বাবাজানের উলা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হযরতের কাছে দোয়া ও অনুমতির ব্যাপারে আদব সহকারে আরজি করার পর হযরত কেবলা আলম বলেন, "তুমি ও ফয়জুল হক মিয়া আমার হুজরার তাকের উপর হতে পীরানে পীর সাহেবের কবাটি শীঘ্র লইয়া আস"। এটা আনার পর হযরত কেবলা আলম প্রথমে নিজেই পরিধান করেন, পরে নিজ মোবারক হাতে তা বাবা ভাণ্ডারীকে পরিয়ে দেন। এটাকে মাইজভাণ্ডারী গবেষকগণ বাবাজানের খেলাফত হিসেবে ব্যক্ত করেন। তাই বিশিষ্ট লিখক, মুফ্তি শাহ্ সুফি সৈয়দ আব্দুস সালাম ঈছাপুরী (রহ.) রচিত বাবাজান কেবলা কাবার জীবন চরিত গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদে খেলাফত লাভ শিরোনামে আছে।

ব-জিসমে আত্হার ওয়া, রুহে আন্ওয়ার,
ব-হুছনে আজ্হার ওয়া খুলকে খোশতর।
ব-হুববে সিদ্দিক (রাদ্বি.) ওয়া জুহদে ফারুক (রাদ্বি.)
ব-ছবরে ওছমান (রাদ্বি.) ওয়া ইলমে ইলমে হায়দর (রাদ্বি.)।
ব-ছবরে মানছুর (রহ.) ওয়া সমছে তিব্রিজ (রহ.),
ব-বাজ্ ওয়া ছিররে বো আলী কলন্দর (রহ.)।
ব-ইশক্বে রুমী (রহ.) ওয়া ছুকরে হাফেজ (রহ.),
খলিফা-এ-গাউস শুদ মুকাররর।

ভাবার্থঃ পবিত্র শরীর, নূরানী আত্মা, অতীব সুন্দর, সৎ চরিত্রের অধিকারী, হযরত সিদ্দিক আকবর (রাদ্বি.) এর মত প্রেমিক, হযরত ফারুকে আজমের মত যাহেদ, হযরত উসমান (রাদ্বি.) এর মত ধৈর্য্যশীল, মওলা আলী শেরে খোদা (রাদ্বি.) এর মত জ্ঞানী, বু-আলী কলন্দর, শামসে তিবরীজ, মনসুর হাল্লাজ, জালালুদ্দীন রুমী, হাফেজ সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মত আল্লাহ্র প্রেমে বিভোর বাবাজান কেবলা গাউসুল আযমের খলিফা নিযুক্ত হন।

গাউসুল আযমের বেসালের সময় বাবা ভাণ্ডারী দরবারে ছিলেন না

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা পাহাড়-পর্বত, সাগর, উপসাগর ভ্রমণ করে দীর্ঘ বার বৎসর পর বাড়ি ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর, তাঁর মোরশেদ পিতৃব্য হযরত আকদস পরলোক গমন করেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের ৮ম সংস্করণের ২৪৭ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত বাবাজান কেবলা হযরতের বেসালের সময় ফটিকছড়ি বিবিরহাটের নিকটে সুন্দরপুর গ্রামেই ছিলেন। এমন কি হযরত কেবলার ওফাতের সময়েও বাড়িতে আসেন নি। হযরত কেবলার ওফাতের পর তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে নিজ বাড়িতে এসে হুজ্‌রায় অবস্থান করেন, যা বর্তমানে বাবা ভাণ্ডারীর পুরান বাড়িতে (হযরতের রওজার পশ্চিমে) প্রথম হুজরা হিসাবে এখনো সংরক্ষিত আছে। এখান হতে তিনি ১৯২৮ ঈসাব্দের ২৪ জানুয়ারি তারিখে প্রিয় নুরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য অলি দরবেশদের সুন্নাত হিসেবে হিজরত করে নবনির্মিত গাউসিয়া রহমান মঞ্জিল নামক দালানের নতুন হুজরা শরীফে তাশরিফ আনেন। (বাবা ভাণ্ডারীর জীবনী ১০৫ পৃঃ দ্রঃ)

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা হতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আজ দেড়শত বৎসর ব্যাপী অসংখ্য মানব-দানব সমস্ত ধর্মের মূল মর্মবাণী “তাওহীদ” বা “কুল্‌ হুয়াল্লাহু আহাদ” এর মর্ম মতে এক আল্লাহ্‌র প্রেমের সুধা পান করে প্রকৃত মু'মিন হয়ে আসছেন। তবুও মাঝে মধ্যে প্রশ্ন আসে, এটা স্বতন্ত্র ত্বরিকা কিনা? আর এর প্রতিষ্ঠাতা কে? গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং এই ত্বরিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, ফার্সি এবং আরবী ভাষায় প্রায় চারশত সাহিত্য ইতোমধ্যে রচিত হয়েছে। আমি পূর্ববর্তী গবেষকদের রচিত গ্রন্থ হতে এ ব্যাপারে অতীব সংক্ষেপে নিম্নে আলোকপাত করছি। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী, “লি কুল্লি জা-আল্‌না মিনকুম্‌ শির আতাউ ওয়া মিনহাজান ওয়া লাও শা আল্লাহু লাজাআ লাকুম উম্‌মাতাও ওয়াহিদাতান”। অনুবাদঃ “আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরি'আত (দ্বীনের বিধি বিধানসমূহ) ও স্পষ্ট পথ (সরলপথ) নির্ধারণ করেছি।” (সূরা মায়িদাহ্‌ আয়াতাংশ : ৪৮) আল্লাহ্‌পাকের এ বাণী অনুসরণে বিশ্বের অন্যান্য স্বতন্ত্র ত্বরিকা যথাঃ জুনাইদিয়া, ওয়াইসিয়া, করখিয়া, ত্বাইফুরিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, হাবীবিয়া ইত্যাদির মত আওলাদে রাসূল, গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ আল মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও মস্‌লকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদার উপর স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর একটি ত্বরিকা।

এই ত্রিবিধ বেলায়তি ধারা নবুয়তী ধারার সমন্বয়ে অর্থাৎ জাহের, বাতেন, তালীমে ইরশাদী সহ, শরীয়ত, ত্বরিকত, মারিফত ও হাকিক্বত এর প্রভাবে এবং সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা রূপ মহাসাগরের উৎপত্তি। বিস্তারিত ‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’ নবম সংস্করণের ১০৪/১০৮ ও ফরহাদাবাদী (রহ.) রচিত ‘ফাত্‌ওয়া-এ-তোহফাতুল আঁখইয়ার’ ১ম খন্ড

৯/১০ পৃঃ ২য় সংস্করণ এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শত বর্ষের আলোকে গ্রন্থ এর ৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন। এই ত্বরিকার সুপরিচিত গ্রন্থ যা বিশ্বে উচ্চমার্গীয় সুফিগণের জন্য পাথেয় "বেলায়তে মোত্লাকার" ১০৪ পৃষ্ঠায় ১৩/৯/১৯৬৮ ঈসাব্দে ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) "উচ্চ ত্বরিকত পন্থীদের জন্য ইহা বিশেষ উপকারে আসবে" মন্তব্য করে অতীব বিনয়ের সাথে "ফক্বীর সৈয়দ মুহাম্মদ আজিজুল হক" (শেরে বাংলা) নাম লিখে দস্তখত প্রদান করেন। আর এই বলে দেওয়ানে আজীজ শরীফে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমামের শুকরিয়া আদায় করেন,

"ব-মাইজভাণ্ডার শুদাহ আরামে গাহশ,
আজিজুল হক ব-জানো দিল ফেদায়শ।

ভাবার্থ

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ তাঁর (মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ইমামের) রওজা শরীফ, আমি (ইমাম শেরে বাংলা) তাঁর উপর প্রাণে ও অন্তরে বিলীন।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক

নির্ভরযোগ্য মাইজভাণ্ডারী গ্রন্থাদী পর্যালোচনা করলে এ ত্বরিকার প্রবর্তক যে আওলাদে রাসূল, ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আযম, শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) তাতে কোন সন্দেহ নাই। যথাঃ সম্মানিত লেখক ও গবেষক শাহজাদা মাওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা আল মাইজভাণ্ডারী (ক.) রচিত "অলিকুল শিরোমনি হযরত বাবা ভাণ্ডারী" ৪র্থ সংস্করণের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "১৩০০ হিজরীর পরবর্তী শতাব্দীর ইসলাম সংস্কারক মুজাদ্দিদ ও রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতিনিধিত্ব করার ভার গাউসুল আযম হযরত আকদস সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। তিনি এই ত্বরিকার ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছিলেন...........।" ইহার ১৯৭/১৯৮ পৃষ্ঠায় ঢাকা ইসলামিক একাডেমি পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠায় "বাংলা মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন" নামক প্রবন্ধে সৈয়দ মর্তুজা আলীর অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক হযরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ চট্টগ্রাম শহর থেকে....। এতে পরিস্কার হয়ে যায় গাউসুল আযম হযরত কেবলা এই ত্বরিকার প্রবর্তক।

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর খলিফা ও কারামত

তাঁর অসংখ্য খলিফা ও কারামত আছে। তাঁর কর্মকাণ্ড খিজ্রী বিধায় এর সঠিক রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়, যেমন, অলি-ই কামিল শাহ্ মাওলানা নজির আহমদ প্রকাশ নজির ফকির আল মাইজভাণ্ডারী (ক.) বানু বাজারের পূর্ব পার্শ্বে ডি.টি রোড, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। শাহ্ মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মদ ইউনুস সোলতানপুরী (রহ.), সাতগাছিয়া দরবার শরীফ, পটিয়া, চট্টগ্রাম। এভাবে আরও অসংখ্য যাঁদের পবিত্র নাম

এখনও জানা সম্ভব হয় নাই। তিনি একাধারে ২৩ বৎসর নীরবতা পালন করেন। এজন্য ইমাম শেরে বাংলা (রহ.) দেওয়ানে আজিজ শরীফের ৪১ পৃষ্ঠায় তাঁর শানে বলেন–

ছো-যে-ত্বাব্‌ক্বায়ে ফানা ফিল্লাহ্ বক্বাবিল্লাহ্ রছিদ,
মোহরে খামুশী দরাদম্ বর দাহানে খোদ্ কশিদ।

ভাবার্থ

তিনি ফানাফিল্লাহ্ বক্বাবিল্লাহ্‌র স্তরে পৌঁছার পর নীরবতার মোহর নিজ মুখে নিজেই মেরে দেন। তবুও "অলিকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী" নামক জীবনীতে ৬৭জন খলিফার পবিত্র নাম উল্লেখ আছে। আর কারামত অধ্যায়ে ২৬টি কারামত এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি দীর্ঘ ১২ বৎসর সমগ্র পাহাড়, পর্বত, সাগরে কঠোর রিয়াজত করার সময় নিজ বেলায়তি শক্তির মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও মনো-বাসনা পূরণ করে মানবতার সেবা করেন।

বাবা ভাণ্ডারী সম্পর্কে মন্তব্য

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় সবাই বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম সম্পর্কে আদব সহকারে অতীব উচ্চ মন্তব্য করেন। তৎমধ্যে শুধু আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) এর মুরিদ ও বাবা ভাণ্ডারীর খলিফা মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনি মাইজভাণ্ডারী (রহ.) এর একটি সর্বজনমান্য কালাম লিপিবদ্ধ করলামঃ

॥ এক ॥

গাউসধন জগতের সোলতান,
হযরত পীরানে পীরের পদে পদবান।
গাউসিয়ত, কুতুবিয়াত দুই পদে সমুন্নত,
গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী-অতি উচ্চ স্থান।
নবীজীর নায়েব তিনি, অলিকুলের শিরোমণি,
গাউস ধনের বেলায়ত জমিন আসমান।
নায়েবে রাসূল হয়ে মুজাদ্দেদী পদ পেয়ে,
স্থাপিয়াছেন মাইজভাণ্ডারে ত্বরিকা প্রধান।
পবিত্র জীবন ভরি কতর্ব্য পালন করি,
প্রভুর নৈকট্য ধামে করিলেন প্রয়ান।
(উপর্যুক্ত পংক্তিগুলো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে রচিত।)

॥ দুই ॥

পাক জীবনের অবশেষে স্বর্গীয় কর্তব্য বশে,
মাওলানা ধনকে করে ছিলেন খেলাফত দান।
পবিত্র জীবনীর মাঝে ঘটনার প্রমাণ আছে,
স্বাক্ষীতে আওলাদগণ আছেন বিদ্যমান।
তাহাতে মাওলানা বাবা ত্রিজগতের কেবলা কাবা
নিঃসন্দেহে হয়ে গেলেন আলমের সোলতান।
মানব দানব গণ ভজে বাবার শ্রী চরণ,
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বলে বাবাজান।
দুই মিলি হল এক, নাই কিছু পারথেক,
যে রাখে পার্থক্য ভাব সে বড় অজ্ঞান।
(উপর্যুক্ত পংক্তিগুলো হযরত বাবা ভাণ্ডারীর শানে রচিত।)

॥ তিন ॥

জগত জোড়া হুকুমত যে না করে শির নত,
রাজদ্রোহী অপরাধী পাক্কা নাফরমান।
মাওলার মুনকের হলে, কে তারে দরবারী বলে,
শুনিলে তাহার কথা হারাবে ঈমান।
রাজদ্রোহী না হইও, বেয়াদবী না করিও,
করিমে কয় সাবধান হওরে মুরিদান।
(উপর্যুক্ত পংক্তিগুলো আশেকগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ।)

বেসাল শরীফ ও জানাযা

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম ৭১ বৎসর ৬ মাস বয়সে ১৯৩৭ ঈসাব্দের ৫ এপ্রিল, ১৩৫৬ হিজরীর ২২ মুহররম, ১৩৪৩ বাংলার ২২ চৈত্র সোমবার ভোর ৭টা ৫৫ মিনিটে বেসাল হন। দীর্ঘ ৪৮ ঘণ্টা পর বুধবার ১১টার সময় বড় শাহজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ খাইরুল বশর সাহেবের নির্দেশে মেজ শাহজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবুল বশর সাহেব জানাযার ইমামতি করেন। জোহরের নামাযের পরে মাওলানা আবু সৈয়দ তোফায়েল আহমদ দ্বিতীয় জানাযার ইমামতি করেন।

খোশরোজ ও উরস শরিফ

প্রতি বৎর ২৭ আশ্বিন বর্তমান তারিখ ২৯ আশ্বিন গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের খোশরোজ ও ২২ চৈত্র পবিত্র উরস শরিফ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ আশেক-প্রেমিকদের সমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.)

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) স্বনামধন্য '৪ (চার) আমিনের' অন্যতম হলেন মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। অন্য তিনজন আমিন হলেন (১) মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (২) মাওলানা আমিনুল হক হারভাংগিরী এবং (৩) সৈয়দ আমিনুল হক পানি শাহ্।

গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর ভ্রাতুস্পুত্র ও খলিফা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। 'ওয়াসেল' তাঁর মাইজভাণ্ডারী পদবি। 'ওয়াসেল' শব্দটি 'আসল' বা 'মূল' শব্দ থেকে আগত। মূল বা আসলের সাথে যিনি সম্পৃক্ত বা আসলের শিক্ষা এবং ব্যাখা বিশ্লেষণ যিনি দিয়ে থাকেন তিনিই ওয়াসেল। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আসল যিনি-ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বিধায় তিনি এ লকব ধারন করে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে এই নামেই সমধিক পরিচিত ও প্রচারিত হন। আধ্যাত্মিক অর্থে তাঁর লকব হলো "ফানায়ে ওয়াসেল"-আসলের সাথে ফানা বা একাকার হয়ে যাওয়া।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতেন। এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর উপর। ব্যক্তিগতভাবে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং তার প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে জনসমক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু ভ্রাতুস্পুত্র পরিচয় বা খলিফা নির্বাচিত হওয়ায় নয়; ব্যক্তিগতভাবেও সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল ছিলেন উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী। এ সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বক্তব্য স্মরণযোগ্য–

'আমি নিজেও হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী সাহেবের নিকট বায়াতে সুন্নাত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। সেই হিসাবে তিনি আমার পীরে বায়াত হন'। উল্লেখ্য যে, তাঁর তিরোধানের পর অছিয়ে গাউসুল আযম পুনরায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কাছে বায়াত গ্রহণ করেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর হাবভাব, কথাবার্তা এবং ইশারা ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা দিতেন বলে তিনি 'কুতুবে ইরশাদ' নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তিনি 'ছোট মাওলানা সাহেব' নামেও পরিচিত।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অনুজ সৈয়দ আবদুল হামিদ এর দুই পুত্রের কনিষ্ঠজন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের জন্ম, শিক্ষা, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু জন্ম তারিখ নয়; জন্মসাল প্রশ্নেও তাঁর স্বজনদের মধ্যে নানা প্রশ্ন আছে। তবে এ তথ্য প্রচলিত আছে যে, তিনি বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের সমসাময়িক এবং বয়সে অনুজ ছিলেন। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কেও একই অবস্থা। তবে জানা যায়, তিনি চট্টগ্রাম মোহছেনিয়া মাদ্‌রাসা হতে কলিকাতা মাদ্‌রাসা বোর্ডের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে টাইটেল পাস করেছিলেন। – (সূত্রঃ রেনেসাঁ যুগের একটি দিক (পৃঃ ১৫)।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে তদীয় বিশিষ্ট খলিফা কাজি আছদ আলী তাঁর কন্যাকে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর সাথে বিয়ে দেন। স্বীয় মনিবের (পীরের) ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল আনুষ্ঠানিক বিয়েতে সম্মত হলেও সংসার–ধর্ম পালন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বর্ণনা ছিল এরূপঃ আমি আমার শরীর-মন-প্রাণ সবকিছু সর্বান্তকরণে আমার মনিব গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর চরণতলে সোপর্দ করে দিয়েছি। সুতরাং এমতাবস্থায় সংসারধর্ম পালন আমার পক্ষে কী করে সম্ভব?

আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য

সচেতনভাবে জাগতিক সকল বিষয় থেকে নিজেকে নিবৃত রেখে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দাওয়াতী কার্যক্রমে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে নিজের মনন, মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। জাগতিকতার আবরণ ও আভরণে চরম আধ্যাত্মিক মহিমান্বিত প্রেম খেলার ‘বৃন্দাবন সম’ এক প্রেম বাগান মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ। এ পবিত্র দরবারের উজ্জ্বল সূর্য গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং সূর্যের আলো পরিপূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত আমিন ধন তথা আমিনুল হক ওয়াসেলের মধ্যে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাথে আমিনুল হক ওয়াসেল এর গভীরতম সম্পর্কের বিষয়টি মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী তাঁর গানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

প্রেম মদে মত্ত হয়ে হরিলাম গো প্রেম বাগানে।
প্রেম নিধি শুইয়াছে-প্রেম ফুলের সিংহাসনে ॥
দীনমণির রূপ নিতে-তারকা মণ্ডল সাথে
নানা ছলে কৌতুহলে-শশী খেলে বন্ধুর সনে ॥
ভাণ্ডার সে বৃন্দাবন, প্রেম নিধি গাউছধন।
আমীন ধন শশী হেন-কহে দাস হাদী হীনে ॥

[রত্ন সাগর, সুফি মৌঃ আবদুল হাদী বিরচিত ৩০নং গান।]

গীতিকার মাওলানা হাদীর পীর ও মুর্শিদ গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী।
'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী', যাঁকে মনের গভীরে ধারণ লালন ও প্রতিপালন করেন 'গাউস ধন' বলে; সেই আরাধ্য গাউস ধন এর আধ্যাত্মিক প্রেম তাড়নার বহুমাত্রিক বিশেষত্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সমাধান বিষয়ে লেখক আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছেন 'মাওলানা আমিন ধন' তথা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর কাছে এভাবে–
মাওলানা আমিন ধন উপায় কি হইবে বল।
গাউস ধনের প্রেম তাড়নায় জীবন ত্যাজিতে হৈল ॥
দেখাইয়ে চরণ ঠার হরি নিল মন আমার।
মন আশে কেঁদে কেঁদে এ নব যৌবন গেল ॥
কাল হৈল এই সার, প্রেমের অনলতায়
কাকনুছ পক্ষীর মত, দহিয়া জ্বলিতে হল ॥
দীন হাদী প্রেমানলে কান্তভাবে না দহিলে।
দুই কুলের মাঝে জান, তোমার কলঙ্ক হইল ॥

[রত্ন সাগর, পূর্বোক্ত ৯৪নং গান।]

'মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ শশী' তথা গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী তাঁর ভক্ত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীকে স্বপ্ন দেখিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে গেলেন। তাঁর আক্ষেপ নিজের শরীর এবং মন পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করার পরও 'গাউসে পাক' কেন তাকে বিরহের আগুনে পোড়াচ্ছেন? তাই 'আমিন ধনের চরণে তথা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের কাছে গীতিকার হাদীর স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে–

হইয়াছি বন্ধুর ভাবে মনতাপে বনবাসী,
স্বপ্ন দিয়া গেলে কোথায় মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ শশী।
বাঁধি মোরে প্রেম ডোরে কি দোষে বঞ্চিলা পরে,
মনদুঃখ বনে বনে কেঁদে ফিরি দিবানিশি।
মনতন সপিলাম যারে সে কেন ভুলিল মোরে,
বিরহ অনলে জলি করে সদা কেলি হাসি।
আমিন ধনের চরণ তলে হীন দাস হাদী বলে,
মন তন সপি কেনে হইলাম তবে প্রেম দোষী।

[রত্ন সাগর, পঞ্চম সংস্করণ, পূর্বোক্ত, ১৬নং গান।]

ত্বরিকার প্রচার-প্রসারে তাঁর ভূমিকাঃ

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাধন পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সামা এবং এতদসঙ্গে হালকা জজ্‌বা। এই সামা ও হালকা জজ্‌বা প্রচলনের ক্ষেত্রে সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা সর্বজনশ্রুত ও সর্বজনস্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে অছি-এ-গাউসুল আযম এর বক্তব্য উদ্ধৃতযোগ্যঃ

হযরত গাউসুল আযম এর এক বুজুর্গ ভ্রাতুষ্পুত্র মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক সাহেব (রহ.) জমায়াতের সাথে বাদ্যসহকারে হালকা জজ্‌বার মজলিশ করিতেন। আঁ হযরত কেবলা কাবার দায়রা শরীফের সোজা দক্ষিণ দিকে মধ্যখানে একটি 'দর' বা বাহির উঠানে আসার পথ বাদ, সৈয়দ মৌং আবদুল করিম সাহেবের যেই কাছারী ঘর ছিল, তাতে ছোট মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক কুতুবে ইরশাদ ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী সাহেব মুরিদান ও পীর ভাইগণসহ নিজে হালকা জজ্‌বা করতেন ও করাইতেন। আমরাও সেই ঘরে হাজির হইতাম ও তাঁহার তালিম নিতাম। এই কাছারী ঘরখানাকে হযরত কেবলা দপ্তরখানা বলতেন। হযরত আকদাস লোক বিশেষকে কোনো কোনো সময় বলতেন, 'দপ্তরখানায়' আমার 'আমিন মিঞার' কাছে গিয়ে বস। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের অন্যতম খলিফা ছিলেন চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানা নিবাসী নাসির মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ীর হযরত শাহ্ সুফি আবদুল বারিক চৌধুরী। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শহরে সামা মাহফিলের প্রথম আয়োজন হয় আবদুল বারিক চৌধুরীর গৃহে। এ মাহফিলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল। উল্লেখ্য এ মাহফিলে সে রাতে হযরত কেবলা আলমের বিখ্যাত খলিফাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই মাহফিলে হাল জজ্‌বা এরূপ হয়ে পড়েছিল যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে যেখানে ছিলেন সেখানেই অজদের সৃষ্টি হয়। এ দৃশ্য দেখে এ বাড়ীতে যারা 'সামা'র বিরুদ্ধে সরব ছিলেন তারাও হতবাক হয়ে যান।

সাধারণতঃ যে সকল এলাকায় সামার বিরুদ্ধে ফতোয়া আসত অথবা যারা সামা প্রতিরোধে সরব হতো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম সেসব এলাকায় হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করে সামার হাকিকত উন্মোচন করতেন। সামা চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের বেখুদি অবস্থা এবং মহান আল্লাহ্ প্রেমে আত্মার আত্ম চিৎকার দেখে বিরোধী পক্ষ প্রায়ই সংযত হয়ে যেতেন।

যাচাই-বাছাই এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা বিভিন্ন গানেও স্থান করে নিয়েছে অবলীলাক্রমে–

হক ভাণ্ডারী আমিনুল হক
আদি অন্তে হকের হক।
যাচাই করে বাছাই করেন
আসল নকল ঠক-বেঠক ॥
ঠক নকলের নাম উঠেনা,
তাঁহার বালাম খাতাতে।

জন্মের সন তারিখের মতো তাঁর ওফাতের সন তারিখ প্রশ্নেও বিভ্রান্তি রয়েছে। কারো মতে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) ওফাতের ৩ বছর পূর্বে, কারো মতে মাত্র ৪১ দিন পূর্বে তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে লোকমুখে শ্রুত হযরত কেবলা আলমের বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে "একই সময়ে একই সাম্রাজ্যে একই সিংহাসনে দু'জন অধিষ্ঠিত হতে পারে না। আমার আমিন মিয়া আমার সঙ্গে থাকবে।"

সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী কেবলার ওফাত সম্পর্কে হযরত শাহ্ সুফি আল্লামা সৈয়দ আমিনুলহক ফরহাদাবাদীর অভিমত হচ্ছে হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের ইন্তেকালের সংবাদ শ্রবণ করে তিনি মাইজভাণ্ডার শরিফ গমনের উদ্দেশ্যে রোসাংগিরি অতিক্রমকালে পথিমধ্যে বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। এ সময় বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম তাঁকে সঙ্গে করে একটি পুকুরে নেমে পড়েন এবং সাতবার এ পাড় ওপাড় সাঁতার কাটেন। এ ঘটনার পর আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ পৌঁছেন। জানাযায় উপস্থিত হলে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলার নির্দেশ মতে আল্লামা ফরহাদাবাদী ইমামতি করেন। কিন্তু তিন তকবীর প্রদানের পর আল্লামা ফরহাদাবাদী আকস্মিক বেহুঁশ হয়ে পড়লে বাকী শেষ তকবীর হযরত কেবলা আলম স্বয়ং প্রদান করে জানাযা সমাপ্ত করেন। এ ঘটনাটি সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের আধ্যাত্মিক অবস্থানের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

ছোট মাওলানা সাহেব কেবলার ওফাত বিষয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও ২৫ অগ্রহাছু তাঁর ওফাত দিবসটি মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। প্রতি বছর ২৫ অগ্রহাছু (১৩ শাওয়াল, ১১ ডিসেম্বর) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে 'গাউসিয়া আমিন মঞ্জিলের' উদ্যোগে তাঁর বার্ষিক উরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি কোনো সংসার ধর্ম পালন করেননি বলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীয় আওলাদগণই তাঁর বার্ষিক উরস ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরীফের সাথে পূর্ব কক্ষে তাঁর মাজার শরীফ বর্তমান।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'ওফাতনামা' নামে পয়ারছন্দে লেখা পুস্তিকায় তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা, তাতে দেখা যায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। 'ওফাতনামা' পুস্তিকার ১২-১৪ পৃষ্ঠায় আমিনুল হক ওয়াসেলের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক মহিমা, বিশেষত গাউসে পাকের সাথে তাঁর সুগভীর বহুমাত্রিক সম্পর্কের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

গাউসে ধনের চল্লিশ দিবস পূর্ব আগে
ভ্রাতৃপুত আমিনুল হক চলি গেল স্বর্গে।
সানি গাউসে ধনের রূপ ছোট মাওলানার।
অকালে চলিয়া গেল স্বর্গের মাঝার।

...

কোথায় গেলে পাব আমি হেন রূপ বন্ত
যে করাইতে পারে দিদার সেই প্রাণের কান্ত

সবে বলে মাওলানা আমি বলি সাম (শ্যাম)
হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ মাওলানার নাম।
(ওফাতনামা, আমিনুল হক হারভাংগিরী)

'সানি গাউসে ধন' ও 'যে করাইতে পারে দিদার সেই প্রাণের কান্ত' এই দুটো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনায় গাউসে পাকের সাথে তাঁর সম্পর্কের মাত্রা এবং 'সবে বলে মাওলানা আমি বলি সাম, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ মাওলানার নাম' এই দুটো চরণে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে তাঁর অবিসংবাদিত গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোপরি তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা সহজেই অনুমেয়।

মূলসূত্রঃ মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর
বাংলা একাডেমী-ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ৯২-৯৪
মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী রচিত 'রত্ন সাগর'।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচক অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জীবন সাধনার ব্যবহারিক তাৎপর্য

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (রহ.) হচ্ছেন বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন মুক্ত বেলায়ত যুগের প্রবর্তক, মহান সম্রাট হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ হযরত সাহেব কেবলা-এর পৌত্র। তাঁর পিতার নাম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল হক (রহ.) এবং মাতামহ হচ্ছেন হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মসিউল্লাহ্ মির্জাপুরী (রহ.)। তিনি হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ বাবাজান কেবলা বা বাবা ভাণ্ডারী-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা। অলি-ই কামিল শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র।

বেলায়তী শক্তির উৎস: হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর পিতামহ অলিগণের সম্রাট হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর নির্দেশে কুতুবে ইরশাদ হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাহেবের নিকট বায়াতের সুন্নত গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ওফাতের পর তিনি তাঁর পিতামহ হযরত গাউসুল আযম সাহেব কেবলা (ক.)-এর হাতে বায়াত হন ও ত্বরিকা কবুল করেন। সুতরাং, হযরত সাহেব কেবলা (ক.) হচ্ছেন তাঁর পীরে ত্বরিকত। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.)-এর নিকট থেকে তিনি রূহানী ফয়েজ হাসিল করেন এবং ইলমে লদুন্নী জ্ঞান অর্জন করেন। সে হিসেবে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন তাঁর পীরে তাফাইউজ। এভাবে তিনি প্রখ্যাত অলি-উল্লাহ্দের বংশধর হওয়ার দরুন তাঁদের খেদমত, সোহবত ও ফয়েজ বরকত প্রভাবের মাধ্যমে এবং একনিষ্ঠ ইবাদত ও রিয়াজত দ্বারা উচ্চতর বেলায়তী শক্তির অধিকারী হন।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর শান সম্পর্কে হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর মহান বাণী: হযরত সাহেব কেবলা (ক.), হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে অত্যধিক স্নেহ করতেন। হযরত সাহেব কেবলা (ক.) সব সময়ে তাঁকে নিয়ে পানাহার করতেন। তাঁকে ছাড়া হযরত সাহেব কেবলা (ক.) কোন আহার্য্য গ্রহণ করতেন না। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর শান সম্পর্কে তিনি যে সকল উক্তি করেন, সেগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একদা কুমিল্লার নবাব হোস্সামুল হায়দার তাঁর নায়েব চিওড়া নিবাসী আজিজ

মিয়াকে বহু হাদিয়া ও উপঢৌকনসহ হযরত কেবলা (ক.)-এর খেদমতে পাঠালে আজিজ মিয়া হযরত সাহেব কেবলা (ক.) সমীপে হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হুজুর! নবাব হোস্‌সামুল হায়দার আপনার খেদমতে এ হাদিয়াগুলো পাঠিয়েছেন।" ঐ সময় হযরত সাহেব কেবলা (ক.) জালালী অবস্থায় ছিলেন। তিনি আজিজ মিয়ার কথা শেষ হওয়া মাত্র বলে উঠলেন, "নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যায়। ফের আওর কোন নবাব হ্যায়?" অর্থাৎ "আমাদের দেলা ময়নাই [হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)] নবাব। আর নবাব কে আছে?"

অনুরূপভাবে বাঁশখালী নিবাসী সুলতান আহমদ নামক এক ব্যক্তি হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। হযরত সাহেব কেবলা (ক.) তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, "হুজুর আমার নাম সুলতান আহমদ।" হযরত সুলতান শব্দ শুনতেই বলে উঠলেন, "তোম্ কোন্ সুলতান হ্যায়? সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।"

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রতি হযরত সাহেব কেবলার (ক.) দুর্লভ স্নেহের নিদর্শনঃ একদা শৈশবকালে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাড়ির আঙ্গিনায় খেলার ছলে মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) রচিত "গাউসে মাইজভাণ্ডার মুঝে শরবত পেলা দো, তৃষ্ণে গিয়ে দেলকো মেরে আজ ভেজা দো.......মাওলা দেখাদো" ইত্যাদি চরণ সম্বলিত গানটি গেয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত সাহেব কেবলা (ক.) ভিতর বাড়ির গদী শরীফ থেকে গানটি শুনতে পেয়ে খাদেমকে ডেকে দুধের শরবত বানাতে আদেশ দিলেন এবং হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে ডেকে পাঠালেন। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (ক.) লজ্জিত বদনে হযরত সাহেব কেবলা (ক.) সমীপে উপস্থিত হলে হযরত সাহেব (ক.) বললেন, "দাদা ময়না, শরবত খাবেন?" হযরত সাহেব (ক.) এক জাম দুধের শরবত থেকে প্রথমে কিছু শরবত পান করলেন এবং বাকী শরবত একবার তিনি নিজে পান করেন এবং একবার হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে পান করান। অবশিষ্ট শরবত অন্যান্যদেরকে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে হযরত সাহেব কেবলার (ক.) খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন দানঃ হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর ওফাতের মাত্র ৪৩ দিন পূর্বে একদা শুক্রবার জুমার নামাযের পর অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্তের উপস্থিতিতে মহল্লা সরদার মরহুম ছায়াদ উদ্দীন ও তার ভ্রাতা মরহুম আছহাব উদ্দীন হযরত কেবলা (ক.) কে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর উত্তরাধিকারী খলিফা হিসেবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বড় ভাই সৈয়দ মীর হাসান সাহেবকে মনোনয়ন দানের জন্য প্রস্তাব করেন। উল্লেখ্য, এ সময় হযরত সাহেব কেবলার (ক.) শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। হযরত কেবলা (ক.) প্রত্যুত্তরে বলেন, "মীর হাসান মিয়া নাবালেগ। আমার দেলা ময়না বালেগ। দেলা ময়নাই গদীতে বসবে।" উল্লেখ্য যে, হযরত সাহেব কেবলা (ক.) হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে স্নেহবশে দেলা ময়না ডাকতেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সৈয়দ মীর হাসান

সাহেবকে নাবালেগ বলার রহস্য বুঝতে পারলেন না। হযরত কেবলার (ক.) মহান ওফাতের মাত্র ৪৩ দিন পর ৯ মুহররম যখন সৈয়দ মীর হাসান সাহেব জান্নাতবাসী হন, তখন সকলে হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর পবিত্র কালামের মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এভাবে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)কে উত্তরাধিকারী খলিফা মনোনীত করেন এবং তাঁর গদী শরীফ অর্পণ করে যান।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে বিভিন্ন ভক্ত, অনুরক্ত, আলেম ও বুজুর্গানে দ্বীনদের প্রশংসাগীতি বা মন্তব্যঃ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে বিভিন্ন বুজুর্গ ও ভক্ত-আশেকগণ যে সকল গান রচনা করেছেন, সেগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। এগুলোর কয়েকটি সারমর্মাকারে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর শান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করার মানসে নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মাওলানা বজলুল করিম বির্‌রাহুল বারী মন্দাকিনী (রহ.) সাহেব বলেন, "হযরত বাবাজান হচ্ছেন ত্রিজগতের নয়নজ্যোতি, বারে ইলাহীর কুদ্‌রতের শান। তিনি গাউস ধনের হৃদয়ের মনি এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর প্রতিচ্ছবি, তাঁর চন্দ্রের মত চেহারা মোবারক দর্শনের জন্য সকলের বুক ফেটে যায়। তিনি চির মহিমান্বিত, বিদ্যার সাগর। তিনি যাকে দয়া করেন, সেই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর কৃপা দৃষ্টি লাভ করে এবং পরিত্রাণ পায়।"

খ্যাতনামা বুজুর্গ শাহ্‌পুরী (রহ.) বলেন, "হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) একজন বিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী, তীক্ষ্মমতি ও জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ। তিনি যেন নবীজীর নিশানরূপ হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)।"

ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ মুছা আলম কাঞ্চননগরী (রহ.) সাহেব তাঁর 'ময়না জগত' গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন কুদরতের মালিক ও আখেরী নিশান। তিনি বিপদের বন্ধু, অলিদের সর্দার, অলিদের অলি ও বেলায়তের বাদশা। তাঁর জবান হচ্ছে অমৃতের ন্যায় মধুর। বিশ্বের সকল স্থানে তিনি বিচরণকারী বা আহমদী শানের অধিকারী।"

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী হযরত শাহ্ সুফি আবদুল্লাহ্ সাহেব (রহ.)-এর সুযোগ্য পুত্র আধ্যাত্মিক দর্শনে অভিজ্ঞ হযরত মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ "গৌরব" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন মূল ভাণ্ডারের সোনার চাবি। যে তাঁর চরণ সেবা করবে, সে দোজাহানে মুক্তি পাবে। তিনি প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না এবং বেশভূষায় তাঁর নেই কোন বিলাসিতা। তাঁর কোন অহংকার নেই, তিনি নিজের নাম প্রচার করেন না এবং তিনি বহুরূপ ধরতে পারেন। তাঁর বদনে যেন হযরত রাসূল করিম (দ.)-এর নূর ও রূপ শোভা পায়।"

প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক গায়ক জনাব আবদুল জব্বার লিখেছেন, "হযরত দেলাবাবা একজন প্রধান অলি, তিনি নূর নবী হযরতের একমাত্র নিশানা। তিনি সকল গুণে গুণান্বিত এবং হযরত

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রিয় পাত্র। তিনি বিদ্যার সাগর। তাঁর মহান অমিয় বাণী মানুষের অন্তরের ময়লা দূর করে। এরূপ অজুদমাখা নূরের জ্যোতি ইহ ও পরকালে দুর্লভ।"

মোহাম্মদ আবুল কাসেম তাঁর 'প্রেমাকর' গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মহান শান বলে শেষ করা যাবে না। তিনি অলিদের ইমাম ও তুলনাহীন। তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পূর্ণাঙ্গ অনুসারী এবং তাঁর লীলাখেলা হযরত খিজির (আ.)-এর অনুরূপ। তিনি নূর নবীর প্রকৃত আদর্শের অনুসারী এবং দ্বীন-দুনিয়ায় হাদী। তাঁর বাণী অমর এবং তিনি আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর হিংসা, দ্বেষ, অহমিকা নেই এবং তিনি তৌহিদী জ্ঞানের শিক্ষক ও দীক্ষাগুরু।"

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন গুণে ও গরিমায় হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি। হযরত নবী করিম (দ.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও আছেন যিনি গুণে, হিম্মতে ও হেকমতে আমার সমকক্ষ।"

হযরত সৈযদ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকৃত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি: হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর ওফাতের অব্যবহিত পূর্বে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তাঁর অছি হিসেবে গদীনশীন করে গেলেন তাঁর একমাত্র মনোনীত ব্যক্তি তাঁর নয়নমণি, মোহসেনীয়া মাদ্‌রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আলেম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে। খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন এক এতিম কিশোর। অনেক বাধা-বিপত্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে এক মহা অদৃশ্য শক্তির তত্ত্বাবধানে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন তাঁর মনিব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার রীতিনীতি ও মূল রহস্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে এবং তাঁর জীবনাদর্শের অনুশীলন ও অদম্য লেখনীর মাধ্যমে তাতে তিনি সফলকাম হলেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজের লেখা কোন বই বা কিতাবাদি রেখে যেতে পারেননি বলে সমালোচকরা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সম্পর্কে মনগড়া ধারণা পোষণ করতে শুরু করে এবং অপব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। আবার কিছু সংখ্যক মতলববাজ, সুবিধাবাদী নিজেদেরকে মাইজভাণ্ডারী বলে জাহির করাতে সমালোচকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় তাঁর বেলায়তী শক্তির দ্বারা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রহস্যপূর্ণ বাণীর অনুসরণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে তৌহিদ বা খোদার একত্বে বিশ্বাসী সকল মানবের মুক্তির জন্য তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মূল্যবান দলিল সম্বলিত কিতাব 'বেলায়তে মোত্‌লাকা', 'মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখ্‌তাছার', 'মানব সভ্যতা', 'বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ', 'এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক', 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লাদে গাউসিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে

গেছেন। ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে তিনি ‘উসুলে সাব্ আ’ বা ‘মুক্তির সপ্ত পদ্ধতি’ সম্বলিত গাউসিয়ত নীতি ব্যাখ্যা করেন এবং আজীবন তা পূর্ণাঙ্গভাবে নিজে অনুসরণ করেন। তাই তিনি আজ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মহান দৃষ্টান্ত। তাঁর মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করে প্রকৃত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার স্বরূপ বিশ্লেষণে নিম্নে কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেলামঃ

(১) আত্মনির্ভরশীলতা: আত্মনির্ভরশীলতা হচ্ছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কারও নিকট কোন কিছুর জন্য মুখাপেক্ষী না হয়ে স্রষ্টাপ্রদত্ত আত্মশক্তিতে নির্ভর করে নিজ সামর্থ্য ও বিচার বুদ্ধি মত সমস্ত সমস্যার সমাধান করতেন। এরূপ অভ্যাস মানুষকে কামনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়, যাকে সুফি পরিভাষায় ‘ফানা আনিল খাল্ক’ বলে।

(২) অনর্থ পরিহার: অনর্থ পরিহার হচ্ছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। যা না হলে চলে এবং উপকারবিহীন এরূপ কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) পরিহার করতেন। পান, চা, তামাক ইত্যাদি অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তিনি বর্জন করতেন যা সুফি পরিভাষায় ‘ফানা আনিল হাওয়া’ নামে পরিচিত। এরূপ অভ্যাস নিশ্চিত স্বর্গবাসের সুসংবাদ দেয়।

(৩) স্রষ্টার ইচ্ছায় সন্তোষ: স্রষ্টার ইচ্ছায় সন্তোষ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) খোদার ইচ্ছার নিকট নিজ স্বার্থ ও বুদ্ধিকে নত করে ধৈর্যের সাথে সকল ব্যাপারে অপেক্ষা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একবার তাঁর দোকানের জন্য শহর থেকে ক্রয় করা মালামাল নৌকাসহ ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনে তিনি এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, “আলহামদুলিল্লাহ্!” সুফি পরিভাষায় এরূপ অভ্যাসকে ‘ফানা আনিল ইরাদা’ বলা হয় এবং এই গুণজ প্রকৃতিকে তসলিম বা রজা বলে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

“অবশ্য যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুসরণ করেছে, সে কি তার তুল্য হতে পারে যে আল্লাহ্র আক্রোশে পতিত হয়েছে এবং তার বাসস্থান নরক এবং নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৬২)।

“আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার আরাধনা ও আমার উৎসর্গ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য।” (সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২)।

“হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্য ও রাসূলের জন্য স্বীকৃত হও যখন তিনি তোমাদেরকে নবজীবন দানের জন্য আহ্বান করেন এবং তোমরা জান যে, আল্লাহ্ মানুষ ও অন্তর সম্বন্ধে বিদিত আছেন এবং নিশ্চয়ই তোমরা তাঁরই দিকে একত্রিত হবে।” (সূরা আনফাল, আয়াত : ২৪)।

“এবং আমরা কেন আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবনা? এবং নিশ্চয় তিনি আমাদেরকে আমাদের পথসমূহ প্রদর্শন করেছেন এবং তোমরা আমাদেরকে যে যন্ত্রনা দেবে তা অবশ্যই আমরা সহ্য

করব এবং আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভরশীলগণের নির্ভর করা উচিৎ।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ১২)।

"অতএব তোমাদেরকে যা কিছু প্রদত্ত হয়েছে ফলতঃ তা পার্থিব জীবনের সম্পদ মাত্র এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র সন্নিকটে যা আছে তা শ্রেষ্ঠতর ও চিরস্থায়ী। (সূরা শুরা, আয়াত : ৩৬)।

(৪) কঠোর সংযম: কঠোর সংযম সাধন দ্বারা মনের উজ্জ্বলতা লাভ বা সাদা মৃত্যু হচ্ছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কঠোর সংযম সাধনা করতেন এবং প্রায় সারা বৎসর নফল রোজা রেখে 'সাদা মৃত্যু' আয়ত্ব করতেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের উপর রোজা বিধিবদ্ধ হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য বিধিবদ্ধ হয়েছিল, যেন তোমরা সংযত হও।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত : ১৮৩)।

(৫) পরদোষ পরিহার ও নিজ দোষ ধ্যানের সাধনা: মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। পরদোষ পরিহার করে নিজ দোষ ধ্যানপূর্বক তা সংশোধন করার অভ্যাস আয়ত্ব করতে পারলে আত্মা বিশুদ্ধ হয় ও 'কাল মৃত্যু' অর্জিত হয়। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দাতে ক্রোধান্বিত বা ঈর্ষাপরায়ন না হয়ে বরং শত্রুতা ও নিন্দার কারণ খুঁজে দেখতেন এবং নিজ দোষ-ক্রুটি দেখলে তা সংশোধন করতেন। নিজেকে নির্দোষ জানলে আল্লাহর দরবারে শোকর করতেন। তিনি চরম শত্রুকেও উদারতার সাথে গ্রহণ করতেন এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে জীবনে কারও সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না।

(৬) লোভ-লালসা থেকে বিমুক্ত হওয়ার সাধনা: লোভ-লালসাকে জয় করার সাধনা হচ্ছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। লোভ-লালসাকে জয় করা সুফি পরিভাষায় 'লাল মৃত্যু' অর্জন বলা হয়। ধন-সম্পত্তির অধিকারী হলেও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন সকল প্রকার লোভ-লালসামুক্ত। গরীব ও দুঃখীজনকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। বাজারে যখন চড়াদামে দ্রব্য বিক্রয় হত, তখন তিনি দরবার শরীফ স্টোর থেকে ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণকে দ্রব্যাদি বিক্রয় করতেন। তাঁর অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া কোন প্রকার কামনা-বাসনা ছিলনা যা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "জেনে রাখ যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি বিড়ম্বনা ব্যতিত কিছু নয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌রই নিকট মহান প্রতিদান রয়েছে।" (সূরা আনফাল, আয়াত : ২৮)।

"যারা পার্থিব জীবন সম্বন্ধে ও পরকাল সম্বন্ধীয় সুদৃঢ় বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীকে বিভ্রান্ত করেন এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন।" (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৭)।

"হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন শুধু উপভোগ ব্যতিত নয় এবং নিশ্চয় পরলোকেই স্থায়ী অবস্থানাগার।" (সূরা মোমিন, আয়াত : ৩৯)।

“যে পরকালের ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে তদীয় ক্ষেত্রে অধিকতর দান করি এবং যে পার্থিব ক্ষেত্র আকাঙ্খা করে, আমি তাকে তা থেকে দান করি এবং পরকালে তার জন্য কোন অংশ নাই।” (সূরা শুরা, আয়াত : ২০)।

“এবং যে ইহজীবন কামনা করে, আমি তাকে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী এখানেই আমার যা ইচ্ছা সত্ত্বর প্রদান করে থাকি। তৎপরে আমি তার জন্য নরক নির্দিষ্ট করে রেখেছি, তন্মধ্যে সে বিদূরিত ও ঘৃণিতভাবে নিক্ষিপ্ত হবে।” (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১৮)।

(৭) নির্বিলাস জীবন যাপন: নির্বিলাস জীবন যাপন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সপ্তম বৈশিষ্ট্য। নির্বিলাস জীবন যাপনের মাধ্যমে ‘সবুজ মৃত্যু’ অর্জিত হয়। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হচ্ছেন নির্বিলাস জীবন যাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কনুইর নিম্ন পর্যন্ত লম্বিত সাদা কাপড়ের জামা, সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি, সাদা টুপি, শীত ও গ্রীষ্মের উপযোগী চাদর এবং পায়ে কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন। তিনি মাটির উপর সাধারণ বিছানায় শয়ন করতে ভালবাসতেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন, “যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের উপমা ঊর্ণনাভের (মাকড়সা) অনুরূপ, যে নিজের জন্য গৃহ রচনা করে এবং নিশ্চয় গৃহসমূহের মধ্যে ঊর্ণনাভের গৃহই অধিকতর ভঙ্গুর যদি তারা অবগত হয়।” (সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪১)।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) আড়ম্বর মোটেও পছন্দ করতেন না। চিঠিপত্রে তিনি ‘খাদেমুল ফোক্বারা’ বলে পরিচিতি ব্যবহার করতেন।

(৮) সত্য-মিথ্যা যাচাইকারী, বৈরাগ্য বিরোধী, কর্মঠ ও মিতব্যয়ী: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সত্য-মিথ্যা যাচাই করে সত্যকে গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন সৎ কর্মানুরাগী। কর্মঠ ও সঞ্চয়ী লোকদেরকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন এবং যে কোন সম্পদকে খোদার রহমত জ্ঞান করতেন ও তার সর্বাধিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করতেন। তিনি পরিবার-পরিজন ছেড়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে বৈরাগ্য সাধনার মাধ্যমে মুক্তি তালাশ করাকে অপছন্দ করতেন।

(৯) দয়ার সাগর: তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সহমর্মী ছিলেন। তিনি পশু-পাখীদের প্রতিও দয়ালু ছিলেন।

(১০) সংযত, ধৈর্যশীল, স্থির ও অটল: তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযত, ধৈর্যশীল, স্থির ও অটল। কখনও কেউ তাঁকে আনন্দে অধিক উল্লসিত ও বিপদে অধীর বা ধৈর্যচ্যুত হতে দেখেনি। জীবনের অনেক উত্তেজনাপূর্ণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুখর সংকটেও তিনি ছিলেন পাহাড়ের মত অটল, অবিচল। ১৯৬১ সনে চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতালে উপর্যুপরি দু'বার অপারেশনে জীবনাশংকা দেখা দিলে এতে তাঁর দুঃখ-বেদনা, ভয়ভীতি না দেখে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বলেন, “আপনার কোন মহাশক্তি আছে। না হলে এ রকম লোক বাঁচতে পারেনা।”

(১১) সদালাপী ও সচ্চরিত্র: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন সদালাপী ও সচ্চরিত্রবান। পরম শত্রুও তাঁর আদব-আখলাক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে না।

(১২) বিশিষ্ট জ্ঞানী, লেখক, গবেষক ও দার্শনিক: ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক ও অর্জিত উভয়বিধ জ্ঞানের সমাবেশ পরিলক্ষিত হোত। যারা তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের কেউই এটা অস্বীকার করতে পারবেন না। যত জটিল ও শ্রুতিকটু হোক না কেন যে কোন বিষয়ে নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করার তিনি সুযোগ দিতেন এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে স্তর নির্বিশেষে বোধগম্য সারগর্ভ জবাব দিতেন। বলা বাহুল্য, তিনি সুফিবাদের উপর একজন উচ্চমাপের গবেষক ও সুপণ্ডিত। তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১৩) অর্থলিপ্সু ও সফরকারী পীরগীরির বিরোধী: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ভক্তের বাড়ী বাড়ী গিয়ে মুরীদ বানানো ও নজরানা নেয়ার কাজকে ঘৃণা করতেন। তিনি গাউসিয়ত নীতি বিরুদ্ধ সায়ের (সফর) পীরি করেননি। তিনি বলতেন, "পরিস্কার হওয়ার জন্য মানুষ পুকুরের কাছে যায়, পুকুর মানুষের নিকট যায় না।" "যে বালি জল শোষণ করে, তাতে কোন উদ্ভিদ জন্মেনা।" প্রকৃতপক্ষে, অর্থলিপ্সু পীরের নিকট থেকে মুরীদ মুক্তির দিশা পেতে পারেনা।

(১৪) সমাজ সংস্কারক, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বজ্র-কঠোর এবং প্রচার বিমুখ: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন এক মহান সমাজ সংস্কারক। তিনি রিসালত ও রাসূলে করিম (দ)-এর পদাঙ্ক অনুসারী এবং গাউসিয়ত নীতির ধারক, বাহক ও পরিপূরক হিসেবে পূর্ণ মানবতাপ্রাপ্ত অলি ছিলেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে কেন্দ্র করে কিছু লোক মনগড়া আচার পদ্ধতি সংযোজনপূর্বক অর্থ উপার্জন ও ব্যক্তি পূজার মানসে ভুয়া পীরি, মুরিদী ও ফকিরীর কুসংস্কার প্রবর্তন করেছে। তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও প্রতিবাদমুখর ছিলেন। তাই তিনি রচনা করলেন মহামূল্যবান গ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা'। এই গ্রন্থে পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে সুফিদের স্বরূপ ও প্রভাব উল্লেখ করা হয়েছে যা মুক্তিকামী মানবজাতির জন্য একটি পথ নির্দেশনা দিতে সক্ষম। মানুষ মাত্রেরই কামনা থাকে এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। কিন্তু তাঁর জীবনের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোথাও নেই অথচ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রচার, কাজকর্ম, রীতিনীতি সব কিছুর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব এক উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় বিদ্যমান।

(১৫) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর অস্তিত্বে বিলীন এবং এক মহান সত্যের প্রতিষ্ঠাতা: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলমাত্র হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর অছি ছিলেন না, তিনি ছিলেন হযরত সাহেব কেবলা (ক.)-এর রহস্য এবং হযরত সাহেব কেবলা (ক.) ছিলেন তাঁর রহস্য। তিনি নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে হযরত সাহেব কেবলা (ক.) নামক মহাশক্তির প্রতিনিধি বা ছায়ামাত্র ছিলেন।

প্রথম জীবনের এতিম অবস্থা, জাগতিক জীবনে নানা বাধা-বিপত্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রত্যেক কিছুর মুখোমুখি তিনি হয়েছেন এক মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তিনি তাঁর সকল জ্ঞান-সম্পদ হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.)-এর ন্যায় হযরত সাহেব (ক.)-এর জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি হযরত ফারুকে আযমের ন্যায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ করে হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর মহান সত্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। হযরত সাহেব (ক.)-এর ধারক, বাহক ও অছি হিসেবে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জাহের ও বাতেন বাণীসমূহের সিন্দুক বা দরজা স্বরূপ, যেরূপ হযরত আলী (রা) হযরত রাসূলে করিম (দ.)-এর জাহেরী ও বাতেনী দরজা স্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল প্রকার কুসংস্কার বিলোপকারী, মহাসত্যের উদ্‌ঘাটনকারী এবং সঠিক পথ প্রদর্শক।

(১৬) বিশিষ্ট সমাজকর্মী: তিনি সমাজের উন্নয়নের জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ভাণ্ডার শরীফ আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুল, নাজিরহাট আহমদিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, নানুপুর গাউসিয়া সিনিয়ার মাদ্‌রাসা, তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী [যেখানে হযরত আলী (ক.)-এর রচিত "দিওয়ানে আলী, ইবনে আরবী (রহ.)-এর তফসীর ও "ফসুসুল হেকম", মাওলানা তোরাব আলী কলন্দর রচিত "মতালেবে রশীদী", মৌলানা রুমী (রহ.)-এর "মসনবী শরীফ", পীরানে পীর দস্তগীর (ক.) রচিত "কসিদায়ে গাউসে সাকলাইন" ইত্যাদি অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থাদির সমাবেশ আছে], নাজিরহাট রেলওয়ে স্টেশনে উরস শরিফের যাত্রী ও ট্রেনের সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে স্থায়ী শেড, এলাকার জনগণ ও দরবার শরীফের চিঠিপত্র আদান প্রদানের সুবিধার্থে ভাণ্ডার শরীফ পোস্ট অফিস, চৌমুহনী নতুন বাজার (ফটিকছড়ি), নাজিরহাট-মাইজভাণ্ডার শরীফ পাকা রাস্তা, শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) সড়ক, মাইজভাণ্ডার শরীফ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতায়ন, মাইজভাণ্ডার গ্রামের মাইজভাণ্ডার নামের সাথে 'শরীফ' শব্দ সংযোজন করে 'মাইজভাণ্ডার শরীফ' নামকরণের সরকারী অনুমোদন লাভ, সর্তা ও লেলাং খালের স্রোত যে সব এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেসব এলাকার খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য গামরীতলা, মাইজভাণ্ডার শরীফ, কিফায়েত নগর, দক্ষিণ গোপাল ঘাটা, রায়পুর, দমদমা, পূর্ব আজিমনগর গ্রামের জমির মালিক কৃষকগণ সমন্বয়ে 'সর্তা লেলাং প্রবাহন এলাকা কৃষি সমিতি' প্রভৃতি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১৭) দুর্গত মানবতার সেবক: তিনি ছিলেন দুর্গত মানবতার অকৃত্রিম সেবক। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নানুপুর, লেলাং প্রভৃতি ইউনিয়নের দুর্গত লোকদের জন্য 'কিচেন কমিটি' গঠন করেন এবং দুঃস্থ লোকদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন। খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার দ্বারা তিনি অনেক দুর্গতকে নিজের প্রত্যক্ষ সেবায় সুস্থ করে তোলেন। অনেক অনাথ বালক-বালিকা ও ভবঘুরে তাঁর আস্তানায় লালিত-পালিত ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১৮) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের উন্নয়ন: মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের শ্রী বৃদ্ধিকল্পে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যও তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর রওজা শরীফ, গাউসিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল ভবন ও গাউসিয়া আহমদীয়া মেহমানখানা নির্মাণ, 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী' নামে একটি সেবামূলক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তির কয়েকটি।

(১৯) গোঁড়ামীমুক্ত ও প্রগতিশীল: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামীমুক্ত ও প্রগতিশীল। গণসভ্যতা ও বিভিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভের জন্য **১৯২১** ও **১৯২২** সনে তিনি বার্মা, কলিকাতা, হুগলী, পণ্ডিচেরী, দিল্লী, আগ্রা ও আজমীর ভ্রমণ করেন এবং বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তিনি বেলায়তের মিরাজহীন কোন লোকের মাজার করার বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন।

(২০) আদর্শ নামাযী ও দ্বীনদার: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন একজন আদর্শ নামাযী ও দ্বীনদার। সুফি মতবাদের ধারক ও বাহক হিসেবে তিনি আজীবন কুরআন ও সুন্নাহ্ তথা শরার পাবন্দ ছিলেন। ছোট বেলা থেকে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযসহ অন্যান্য নফল ইবাদতে নিজেকে সদাসর্বদা মশগুল রাখতেন। তিনি প্রায়শঃ রোজা রাখতেন। মুরীদের প্রতি তাঁর প্রথম উপদেশ ছিল নামায পড়, রোজা রাখ, মিথ্যা বলনা, চুরি করনা, জ্বেনা করনা। সকলের নামায পড়ার সুবিধার জন্য তিনি দরবার শরীফ মসজিদ, ইবাদতখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কুরআন তিলাওয়াত তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল।

আজকাল কিছু কিছু তথাকথিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীদের বলতে শোনা যায় যে, মাইজভাণ্ডারীদের জন্য নামায-রোজার দরকার হয় না। নাউজু বিল্লাহ্! ওরা হচ্ছে ভণ্ড। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আসল শত্রু। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

(২১) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের তাঁর কাছে অবাধ গমণের অনুমতি ছিল। তাঁর কাছে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম এরূপ কোন ভেদাভেদ ছিল না। সকল প্রকারের চরিত্রবান লোককে তিনি আদর যত্ন করতেন এবং মনোযোগসহকারে তাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করতেন। বলা বাহুল্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবপ্রীতি ও সার্বজনীনতা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জীবন ও চরিত্র কুসংস্কারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল: হক বা সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইবাদত। আজ আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। মনগড়া, ভুয়া রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ত্বরিকতপন্থীদের কলুষমুক্ত করে সত্যিকারের ইসলাম ও সুফিবাদের

আদর্শালোকে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এর জন্য সকলের দায়িত্ববোধের উন্মেষ ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতা প্রয়োজন।

আজ ব্যক্তিপূজা ও ধনার্জনের মধ্যে অনেকে ত্বরিকাকে কুক্ষিগত করার প্রয়াস পাচ্ছে। জন্মদিবস বা খোশরোজ এবং মৃত্যু বা ওফাত, আজ আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই দুই অনুষ্ঠানের বহুল প্রবণতা আজ লক্ষ্যণীয়। গ্রামে-গঞ্জে আজ স্বপ্নপ্রাপ্ত ভুয়া হাজার হাজার ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা মাজার, হাজার হাজার ভুয়া গাউসুল আযম উদয় হওয়ার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জমিদারী প্রথার ন্যায় এটা বংশানুক্রমিক সংক্রামক ব্যাধির রূপ পরিগ্রহ করেছে। যার ফলে আসল-নকল কিংবা মূল ও শাখার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। ধর্ম ও ত্বরিকার নামে মানুষ আজ সন্ত্রস্থ ও সমালোচনামুখর। ফলে কিছু লোক আজ পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং বাকী লোকজন ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই আজ আমরা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে যে সত্যকে জানতে ও বুঝতে পেরেছি, তাঁর রেখে যাওয়া সে আমানত বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরে সকলকে কুসংস্কার বর্জিত মহাসত্যের দিকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রত্যেক শহর ও গ্রামে 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী' নামে একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও তৎসংলগ্ন 'জ্ঞানভাণ্ডার' নামে একটি গবেষণামূলক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে তাঁর রচিত ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কিতাবাদির মাধ্যমে এই মহান সত্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তরিকতপন্থী সকল ভাইদের উচিৎ এ প্রতিষ্ঠানকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা ও সংরক্ষণ করা। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সভা, আলাপ-আলোচনা, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, গ্রন্থ রচনা, গবেষণা প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিকামী মানবসমাজের দোরগোড়ায় মহান সত্যকে পৌঁছিয়ে দেয়া সম্ভবপর হবে। আসুন, আমরা সকলে আজ এ মহান আদর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হই। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকল্পে বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও কুসংস্কার প্রতিরোধমূলক সংগঠন গড়ে তুলি। বলা বাহুল্য, হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মহান আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারলেই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন-

"আহ্বান আসিল মোর মর্তুজা হইতে
নূরে চেরাগে আহমদ মোস্তফা হইতে,
পুরাতন দিনগুলোর সাজসজ্জা তুমি,
আমার ডাক, আমার ঢোল, আমার বোল তুমি।
আনন্দে নৃত্য কর আপন জনমনে,
গোলাপ আম্বর গন্ধ দাও সর্বজনে।
সামনে আছে কাবা আমার পেশ কদমে চলেছি,
দেমাগেতে সুন্নাহ্‌র ছানা সূক্ষ্ম মাথা গড়েছি।

পরনেতে অলির পরশ পন্থা নির্দেশ দিয়েছি,
অনর্থেরী পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি,
ধৃতি, স্নায়ী, দুঃখ-বেদনায় কতইভাবে দেখেছি,
তুমি আমার প্রাণের সখা কতরূপে পেয়েছি।
ধনে ধ্যানে, প্রাণে, রূপে যতইভাবে বুঝেছি,
সর্বস্থানে তোমার রূপ আমার ডালে দেখেছি,
তুমি আমার, আমি তোমার, সর্বস্থানে জেনেছি,
তাই বুঝি তুমি ছাড়া অন্য হাস্তি বিনাশী।
হোসাইন তোমার পাগলপারা, সর্বস্থানে বিরাজমান,
এদিক ওদিক দু'দিক ছেড়ে জোর কদমে আগুয়ান।"

পরপারে পদার্পণ: এই মহান অধ্যাত্ম পুরুষ ১৯৮২ সালের ১৬ জানুয়ারী শনিবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে সকল ভক্ত, অনুরক্ত ও শিষ্যবৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে পদার্পণ করেন। তাঁর এই ওফাত দিবসটি ছিল আরবী সালের গৌরবময় মাস রবিউল আউয়ালের ২০ তারিখ এবং বাংলা সালের পুণ্যময় মাস মাঘের ২ তারিখ। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী একই দিন পূর্ণ শরিয়তী প্রথায় অগণিত লোকের নামাযে জানাযা শেষে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভক্ত, অনুরক্ত ও মুরিদগণের পরম শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফস্থ বাগে হোসাইনীতে পারিবারিক গোরস্থানে নিতান্ত অনাড়ম্বর অবস্থায় সমাহিত হন। তাঁর কবরগাহে কোন প্রকার সৌধ বা মাজার গৃহ নির্মাণ থেকে বিরত থাকার জন্য সকলকে তিনি নির্দেশ দিয়ে যান। কবরস্থান সংলগ্ন জিয়ারতগাহে তিনি লিখে যান তাঁরই অনাদিকালের স্রষ্টা মিলনের নিম্নোক্ত দার্শনিক বাসর গীতি........

"মানব প্রকৃতির কঠিন আকৃতি, তোমার মদিরা পাত্র।
সরস মাটির বিশাল দেহ, তোমারই ফুল ক্ষেত্র।
কোলাহল পরিহারে, নির্জনতার আসরে
তোমারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি, তোমারই বাসরে।"

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী: *প্রফেসর, (অবসরপ্রাপ্ত) অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সহ-সভাপতি মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।*
সভাপতি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট, গবেষণা ও প্রকাশনা পরিষদ।

সুফিবাদ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন : প্রসঙ্গ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

॥ এক ॥

পবিত্র ইসলামের প্রকাশ ও প্রসারের ইতিহাস পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, আবির্ভাবের পর থেকে এই ধর্ম মানব ইতিহাসে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বজনীন ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধের এক অভূতপূর্ব উন্মেষ ঘটিয়েছে। সম্যক অর্থে মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইহ ও পরকালের শান্তি প্রত্যাশার নামই ইসলাম। বস্তুতপক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে খোদাভীতি ও শেষ বিচারের উপর ধারণা এবং পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও রাসূল (দ.)-এর পবিত্র জীবনযাত্রার নানাবিধ কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে কঠিন আত্ম-সংযমের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের যে অভিনব সাধনা, ইসলামী ব্যবস্থায় এরই নাম হচ্ছে সুফিবাদ।

আধ্যাত্মবাদের ধারণায় সুফিসাধকগণ কুরআনের কিছু কিছু বাণীকে গুপ্ত জ্ঞানের (Esoteric) উৎসরূপে ব্যাখ্যা করেন। এইসব আধ্যাত্মিক সাধকগণ শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা আচার সমূহের মধ্যে বিভিন্ন কার্য-কারণ (Cause & Effect) খোঁজার চেষ্টা করেন না, তাঁরা অন্তরের গভীরতায় স্বর্গীয় প্রেমের মোড়কে সত্যের নিগূঢ়তাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেন। এই পথ পরিক্রমায় যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়েছে গুরু সাধনা বা আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের পথে নিজেকে উৎসর্গ করা, যেটি মহান স্রষ্টার সাথে প্রকৃত বন্ধনের পথকে সহজ ও প্রশস্ত করে। মুসলিম চিন্তাবিদগণ প্রায় সকলে একমত যে, এই সুফি সাধনার ইতিহাস হযরত মোহাম্মদ (দ.) থেকে শুরু। নবী করিম (দ.)-এর জীবদ্দশাতে মসজিদ-ই নববীতে কতিপয় সাহাবী ধ্যানে তন্ময় থাকতেন, তাদেরকে 'আহলুস্ সুফ্‌ফা' বা "আসহাবে সুফ্‌ফা" বলা হত। এই 'আহলে সুফ্‌ফা' বা 'আসহাবে সুফ্‌ফা' থেকে সুফি শব্দটির উদ্ভব। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগকে কেন্দ্র করে তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও অভ্যন্তরীণ চরিত্র গঠন এবং সাধনা পদ্ধতিসহ সব কিছু ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আবার অনেক মনীষীর মতে সুফি শব্দটি গ্রীক শব্দ (Sophia) সোফিয়া (অর্থ প্রজ্ঞা) এবং সফেস (অর্থ প্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী) থেকে গৃহীত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানের স্থপতি ইবনে খলদুনের ভাষায় ইসলামের 'প্রথম যুগে অতীব সাদাসিধে ধরণের পশমের তৈরী পোশাক পরিধেয়রা সুফি নামে পরিচিত ছিলেন।' ঈমাম আল-গাযালীর মতে 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তন্ময়তা ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে সুফির বৈশিষ্ট্য অর্জন সম্ভব'। জীবন-যাপনের কঠোর বাস্তবতার ভেতর থেকে আধ্যাত্ম সাধনার উচ্চমানে পৌঁছানো এর উদ্দেশ্য। রাসূল পাক (দ.) বলেছেন, "যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আল্লাহ্‌কে চিনতে পেরেছে"। আত্মবিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের একনিষ্ঠ প্রয়াসই হচ্ছে সুফিদের প্রকৃত

দর্শন। আত্মপরিচয় সন্ধানের পন্থাকে সাধনার অন্যতম উপায় হিসাবে সুফিরা গ্রহণ করে থাকেন। সুফিসাধকগণ অন্তরে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবনকে কলুষমুক্ত করে এমন সুন্দর ও অনুপম জীবন গড়ে তোলেন যা অন্যের জন্য অনুসরণ বা অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকে। এভাবে পথ প্রদর্শক বা মুর্শীদ ধারণা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে সমধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অনুসরণকারী বা মুরীদ একজন পূর্ণ মানব হওয়ার সকল জ্ঞান অর্জন করে আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়ায় মুর্শিদ বা পীরের নিকট 'ফানা-ফিশ্ শায়েখ' হিসেবে গণ্য হন।

সুফিদর্শনের প্রায়োগিক সকল বিষয় কঠোর সাধনার মাধ্যমে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও আনন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক স্বর্গীয় সত্ত্বায় মুক্ত প্রেমবাদের বীজ বপনকারী এবং খোদার নৈকট্য লাভের শর্ত হিসেবে সামগ্রিক আত্মিক ও আর্থ-সামাজিক মঙ্গল সাধনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী দর্শন হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শন। এই দর্শনের সূচনাকারী হচ্ছেন হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। বস্তুতপক্ষে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে ইহকাল এবং পরকালের জীবন ব্যবস্থার প্রতি অবিচল আস্থা, ধারণা ও পরিচর্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে নিগূঢ় প্রেমের নিবেদন ও বন্ধন স্থাপন করা হয়, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তার সার্বিক প্রতিফলন ঘটিয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) মানব মুক্তির পবিত্র সনদ তথা মাইজভাণ্ডারী দর্শন রচনা করে গেছেন। নবুয়তের ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত বেলায়তী শক্তির এক সুবিশাল মহীরূহ হিসেবে যুক্তি ও জ্ঞানের সূচারু সম্মিলনে দেহ ও আত্মার উন্নয়নের মননশীল পরিক্রমায় শরীয়ত, ত্বরীকত, হাকিকত ও মারফতের এক অপূর্ব সমন্বিত রূপই হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী দর্শন।

ধর্মের বেসাতি করে ভণ্ডামি ও নষ্টামি দিয়ে যারা সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছিল, তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একজন প্রতিবাদী সাধক হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় ও স্পষ্ট করেছেন নিষ্কলুষ পবিত্র এবং সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ও অনুকরণীয় এক সুমহান আদর্শ হিসেবে। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর জীবনদর্শনকে ভিত্তি করে ধর্ম-কর্ম ও জীবন নির্বাহে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়া (ফানা আনিল খাল্ক), অনর্থক কাজ-কর্ম, কথা বার্তা পরিহার করা (ফানা আনিল হওয়া) ও খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া (ফানা আনিল এরাদা)-এই তিন মহৎ গুণের সমাহারকে ব্যক্তিত্ব ও বিকাশের প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে আত্মসংযম, আত্মসমালোচনা ও নির্বিলাস জীবনের ধারাবাহিকতায় সর্বোপরি আত্ম-পরিপূর্ণতার পবিত্র দিক-দর্শন দিয়ে গেছেন এই মহান অলি।

মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রবর্তক হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসাবে কালক্রমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন পবিত্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দ্বিতীয় মহান অলি হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এই প্রসঙ্গে আল্লামা রুমীর বাণীটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য– "প্রত্যেক বৃত্তে জগতের আবর্তন-বিবর্তনের যুগে একজন বিশিষ্ট অলি থাকবেন যাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।" মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রবর্তন ও বিকাশের ধারাবাকিতায় উল্লেখিত মহান অলিদের আশীর্বাদ ও ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীতে আরও অনেকে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে গৌরবদীপ্ত হয়েছেন।

॥ দুই ॥

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৯২৮-৮৮খ্রি:] ছিলেন মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ধারক, বাহক এবং আধ্যাত্মিক জগতের এক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রপৌত্র, গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) দৌহিত্র এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বড় পুত্র। অধ্যাত্মবাদের মূলে স্রষ্টার প্রতি গভীর ভালবাসা জাগিয়ে মানব হৃদয়ের উৎকর্ষতা সৃষ্টির দর্শনকে যিনি নিজ জীবনে সকল পরশে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি হলেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তাঁর কণ্ঠে সর্বদা উচ্চকিত ছিল স্রষ্টার প্রেমে বিলীন হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান। 'টাকা-সম্পদ-দুনিয়া পূজার জন্য নয়, আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের জন্য মানুষের সৃষ্টি'–এই বাণীর মাধ্যমে এই মহান অলি বিপথগামী মানুষকে যথাযথ ও সঠিক ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সন্ধান দিয়ে গেছেন।

চার বছর বয়সে 'খাদেমুল ফোক্বারা' উপাধিপ্রাপ্ত অছি-এ-গাউসুল আযম খ্যাত আপন পিতার নিকট শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী বিদ্যা-শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া জুনিয়র মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি করোনেশান প্রাইমারী স্কুল, নানুপুর আবু ছোবহান উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাইস্কুল থেকে মেট্রিক, অতঃপর চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে বি.এ পরীক্ষার তৃতীয় দিনে খালি খাতা জমা দিয়ে জাগতিক শিক্ষার ইতি টেনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট হন। তাঁর আচার-আচরণ এবং জীবন-যাপন এমন এক ধরনের বিচিত্র বিশিষ্টতায় প্রকাশ পাচ্ছিল যাতে আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল তাঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের শীর্ষে অবস্থানরত পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জানান দিলেন, "আমার বড় মিয়া আল্লাহ্র পাগল। সাধনাবলে যেখানে উঠেছেন, তার উপরে ইনসানিয়াতের (মানবতার) আর কোন স্তর নেই।"

এটি সর্বজনবিদিত যে, নবী-রাসূল, অলি-আল্লাহর মাধ্যমে মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ পবিত্র ইসলামকে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অনেক সমৃদ্ধ করেছে। রাসূলপাক (দ.)-এর পূর্বে পৃথিবীতে যত নবীর আবির্ভাব ঘটেছে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিশেষ মু'জিযার অধিকারী ছিলেন। রাসূল করিম (দ.) অসংখ্য মু'জিযার বা অলৌকিক ঘটনার প্রকাশক।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদের প্রিয় রাসূলকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উভয় প্রকার মু'জিযা দান করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত করেছিলেন। আল্লাহ্ বলেন, "ওয়া রাফানালাকা যিক্‌রা"-অর্থাৎ আমি আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি (সূরা ইনশিরাহঃ আয়াত-৪)। অল্প খাবার দিয়ে অনেক লোককে খাওয়ানো, স্বল্প দুধের বাটি থেকে অনেক লোককে তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করানো, ইশারা করে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা এ রকম অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ করেছেন তিনি। হযরত ঈসা (আ.) এ রকম অলৌকিক ঘটনা দেখানোর উল্লেখ করে বলেছেন, "আন্নী আখলুক লাকুম মিনাত্তীনি কাহায়া আতিততায়ারী ফা আনফুখু ফীহি ফাইয়াকুনু তায়রাম বি ইসনিল্লাহ"–আমি তোমাদের জন্য কাদা দিয়ে একটি পাখির মত আকৃতি গড়ব। তারপর তাতে ফুঁক দিব, ফলে তা জীবন্ত পাখি হয়ে যাবে। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত-৪৯)। অনুরূপভাবে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রবক্তা মহান অলি হযরত শাহ্ কেবলা, হযরত বাবাজান কেবলা এবং সর্বোপরি শাহানশাহ্ হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল সাধনে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন এবং জ্যোর্তিময় মহাপুরুষ হিসেবে মানুষের হৃদয়ে খোদা প্রেম জাগ্রত করে সৎ, সুন্দর, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী জীবন যাপনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে গেছেন।

কঠিন রিয়াজত যেমন পৌষের হাড় কাঁপানো শীতে বাড়ির পুকুরে ও বাড়ির পশ্চিমে লোহার খালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুব দিয়ে থাকা, অনাহার, নির্ভোগ, নির্ঘুম, নির্লোভ অভ্যাস আয়ত্বের মাধ্যমে অধ্যাত্ম সাধনার চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন। পরিণতিতে স্বপ্নে হযরত শাহ্ কেবলার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে তাঁর পিতা খয়েরী রংয়ের চাদরটা পুত্রের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন, "হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র মহান আমানত আমার হেফাজতে ছিল তা আজ আপনাকে অর্পণ করলাম। হেফাজত করবেন।" এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে, জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীই (ক.) সত্যিকার অর্থে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর যোগ্যতম প্রতিনিধি। পরবর্তীতে এই মহান অলি শুধুমাত্র বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বা মু'জিযা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের মঙ্গল সাধন করেননি, অধিকন্তু তিনি সকল স্তরের বিপথগামী মানুষকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী করে যথার্থ জীবন-যাপনের পথ-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁর অমর বাণীসমূহের মধ্যে উল্লেখ্য : "হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে", "মাইজভাণ্ডার শরীফ-হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার", "আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস-আল্লাহ্‌র ঘর, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র।"

এই মহান অলি এই অঞ্চলের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ছাড়া সেলুলার ফোনের বিপুল ব্যবহার, অনিবার্য অপারেশন ছাড়া রোগ মুক্তি, বোবার মুখে বাক্য ফোটানো, পিটিয়ে একশিরা রোগ থেকে আরোগ্য লাভ, যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর পুনর্জীবন লাভ, হারানো দলিলের সন্ধান, তেল ছাড়া গাড়ি চালানো, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্তি, নিঃসন্তান দম্পত্তির সন্তান লাভ ইত্যাদি অগণিত মু'জিযা প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন। মাওলানা রুমী বলেন– "আল্লাহ্‌র অলির সাথে এক মুহূর্তের সাহচর্য লাভ করা শত বৎসরের ইবাদতের

চাইতে উত্তম” ও “যারা অলি-আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকবে, তারা খোদার রহমত লাভের পথ থেকে দূরে সরে পড়বে।” এই মহান অলির সান্নিধ্যে এসে বহু পাপী-তাপী, অখ্যাত-কুখ্যাত ব্যক্তি জীবনে আত্মিক, আর্থিক এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছেন। এই মহান বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৯৮৮ সালের ১৩ অক্টোবর তাঁর শত-সহস্র ভক্তদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে, সকলকে আশীর্বাদপুষ্ট করে এই জগত ছেড়ে মহান স্রষ্টার মিলনে আবদ্ধ হন। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. ড. এম. এ. রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

২. জে. এস. সোবহান : সুফিজম- ইটস সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস

৩. ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, স্মরণ : সুফি সম্রাট হযরত গাউসুল আযম আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.), দৈনিক পূর্বকোণ, ২৫ জানুয়ারী, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ৮

৪. জামাল আহমদ সিকদার : 'বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন, দর্শন, কারামত এবং এর ব্যবহারিক তাৎপর্য', মাইজভাণ্ডারী একাডেমী, চট্টগ্রাম।

৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম : প্রসঙ্গ : ইসলাম-প্রিয়নবী (দ)-এর মু'জিযা, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০০৫, পৃষ্ঠা : ৬

৬. ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী : মাইজভাণ্ডারী দর্শন, উৎপত্তি, বিকাশ ও বিশেষত্ব

৭. লাভলী আখতার ডলি : বাংলাদেশে সুফি দর্শনের রূপরেখা।

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

উপাচার্য,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়;

উপদেষ্টা, মাইজভাণ্ডারী একাডেমী।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন, দর্শন, কারামত এবং এর ব্যবহারিক তাৎপর্য

জামাল আহমদ সিকদার

এই মহান অলি আল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক ঘরানারই একজন স্বনামধন্য কিংবদন্তিসম বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম। বিশ্বব্যাপি প্রভাব বিস্তারকারী আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে তিনি 'শাহানশাহ্ বিশ্বঅলি' বলে খ্যাত হন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর প্রপৌত্র, গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) দৌহিত্র এবং 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (রহ.) জ্যেষ্ঠ পুত্র।

১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১২ রজব ১৩৪৭ হিজরী, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ সুবেহ্ সাদেক অর্থাৎ ঊষালগ্নে তিনি মাইজভাণ্ডার শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে বিদ্যা শিক্ষার 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করেন আপন কামিল পিতার নিকট। প্রথমে তিনি মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া জুনিয়র মাদ্‌রাসায় (অধুনালুপ্ত) ভর্তি হন। ফটিকছড়ি করোনেশান প্রাইমারী স্কুলে ও নানুপুর আবু ছোবহান উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। অতঃপর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হাই স্কুল থেকে ১৯৪৮ সালে মেট্রিক পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই.এ. পাশ করেন। ১৯৫৩ খ্রি. কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে বি.এ পরীক্ষার তৃতীয় দিনে খালি খাতাটা জমা দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়িতে চলে আসেন। এখানেই তাঁর জাগতিক শিক্ষার যবনিকা। অতঃপর শুরু হয় তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা-সাধনা।

স্নেহময়ী মা তাঁর জন্য গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারে আর্জি করেন, 'আমার এই ছেলে জীবনে কখনো কষ্ট করে নাই। তাই আমার বাবার মত পাহাড়ে-জঙ্গলে কষ্টকর রিয়াজত করতে পারবেনা। তাঁর রিয়াজত-সাধনা যেন দরবারেই সম্পন্ন হয়'। তাঁর আর্জি কবুল হয়েছিল। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগত এক মহা পাঠশালা। এ পাঠশালায় জ্ঞান অর্জনে প্রয়োজন কঠোর কঠিন রিয়াজত-সাধনা। বাড়িতে প্রথম দিকে অন্যমনস্ক হয়ে দিন কাটাতেন। খাওয়া, দাওয়া, গোসল, বিশ্রাম সবকিছু ভুলে যেতেন।

"আমার দিগন্ত বিস্তারী উম্মত্ত তাড়নার সম্মুখে ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল একটি সামান্য শিকার মাত্র। হে মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষের শক্তিময় প্রকাশ! তোমার ফাঁস দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরো।" --কবি আল্লামা ইকবাল।

নিকট আত্মীয়দের জোর দাবী তাঁকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হোক। বোয়ালখালী থানার খিতাপচরের ভক্ত সৈয়দুর রহমান 'বড় মিঞা' আসলে পাগল কিনা

জানতে চাইলে পিতা বলেন, 'লোকেরা যে রকম মাথা খারাপ মনে করেছে তেমন নয়, আমার বড় মিঞা আল্লাহ্‌র পাগল। সাধনাবলে যেখানে উঠেছেন, তার উপরে ইনসানিয়াতের (মানবতার) আর কোন স্তর নাই'। 'তাহলে কেন পাবনা পাঠালেন'-অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'মা-ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনের মন বুঝানোর জন্য'। হাসপাতালে ঔষধ খেতে চাইতেন না। নিরিবিলি বসে বসে বিড় বিড় করে বলতেন, "ওগো বন্ধু! তোমাতে আমাতে পর্দা কেন"। পর পর দশবার ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। শক দেওয়া রোগী যেন হিম-শীতল মৃত দেহ। দীর্ঘ ৬ মাস পর আশ্বিন মাসে বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ শরীফের কথা বলে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। পিতা রাজি না হওয়ায় হাসপাতালে আর যাওয়া হয় নাই। নিজ শরীরকে আগুনে সেঁকে, পানিতে ভিজিয়ে, সূর্যের দিকে চোখ ঝলসিয়ে, সর্বোপরি হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরীফের প্রতি দিনের পর দিন দু'চোখ নিবদ্ধ করে তিনি অর্জন করেন সর্বোচ্চ মর্যাদা 'বেলায়তে ওজমা'।

তখন হযরত সাহেব কেবলার রওজা শরীফে জিকির মাহফিল হতো। সে রাত্রে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ধলই নিবাসী মরহুম আবদুল গণি ফকির, মরহুম আবদুল রহমান মুন্সিসহ বহু লোক মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। জিকির শেষ হলে তাঁরা রওজা শরীফে তাজিমী সেজদা করেন। ঠিক সে সময় তিনি রওজা শরীফের দরোজায় উপস্থিত হন। সকলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'নামায কালাম না পড়ে কিসের এতো নাচানাচি! আবার সেজদা কেন'? বলতে বলতে ভিতরে ঢুকে যাকে সামনে পেলেন, মারলেন। যে যেদিকে পারেন ছুটে গিয়ে তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করেন। তিনি ছেলেকে হুজরায় ডাকেন। হুজরার সকল দরোজা-জানালা বন্ধ করে দেন। তারপর পিতা-পুত্র প্রশ্ন-উত্তরে আলাপ শুরু করেন। পুত্র জিজ্ঞাসা করেন, 'হযরত কেবলা কে? বাবাজান কেবলা কে'? পিতা জবাব দেন. "আল্লাহ্‌র অলি! দু'য়ে মিলে এক"; পুত্র আবার প্রশ্ন করেন, 'আপনি কে?' তিনি উত্তর দেন, 'আমি হযরতের অছি এবং বাবাজান কেবলার ফয়েজপ্রাপ্ত। তাঁরা আমার মধ্যে আছেন'। পুনঃ কি যেন প্রশ্ন করলেন, (অশ্রুত)। এতে পিতা (রাগতঃ) উচ্চৈস্বরে বলেন, "আমাকে এখনো কি চিন নাই? আমি কে তা কি দেখবে?" তারপর অনেকক্ষণ নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। দরোজা খুলে দিলে বাইরে অবস্থানরত লোকেরা দেখে পিতার মুখমণ্ডল রক্তিম লালিমাময়। পুত্র দু'হাতে ভর দিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছেন, ভীত-বিহ্বল, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। পিতা খাদেমদের নির্দেশ দিলেন, "ওকে আন্দর বাড়িতে নিয়ে যাও"। ধরাধরি করে তাঁকে মায়ের বিছানায় নিয়ে শোয়ানো হলো। ছেলের অবস্থা দেখে মা রুদ্ধবাক। সেবিকারা মাথায় পানি ঢালতে লাগলো। বহুক্ষণ পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেন। কিন্তু রাতে ঘুম হয়না। এঘর-ওঘর ছুটাছুটি করেন। বাবার হুজরায় গিয়ে বারবার ডাকতে থাকেন। পিতার স্নেহভরা কণ্ঠ, 'ঘুমুতে যাও'।

পরদিন বিকালে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা শরীফে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। প্রায় দু'ঘণ্টা মাথা উঠাবার লক্ষণও নাই। পিতা খাদেমদের নির্দেশ দেন, 'উঠিয়ে দোকানের চেয়ারে বসিয়ে দাও'। চেয়ারে বসালে ঢলে পড়তে দেখে ওমর আলী ফকির ও খাদেম হাবিবুর রহমান পাঁজাকোলা করে অফিস কক্ষে এনে শুইয়ে দেন। আন্দর

বাড়িতে খবর গেলে মা ও অন্য মেয়েরা কাঁদতে লাগলেন। অফিসের সামনে বহু লোক জমায়েত। সন্তানের এমনি করুণ অবস্থা দেখে পিতা অঝোরে কাঁদেন। ফলে উপস্থিত লোকেরাও কাঁদতে থাকেন। পিতা আবেগ ভরে বলতে লাগলেন, “আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করাতে মন একটু গরম হয়। যে শক্তি আমি তার উপর ঢেলেছি মণির পাহাড়ে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ঢাললে সে পাহাড় টলে যেতো; সাগরে দিলে সাগর জলশূন্য মরুভূমি হয়ে যেতো। আমার রক্তের বান (উত্তরাধিকারী) বলে এখনো টিকে আছে।” মধ্যের কামরায় সারা রাত পানির ধারা দেওয়া হয়। সকালে হুঁশ হলে মাকে বলেন, ‘মা আমার সিনা (বক্ষ) জ্বলে-পুড়ে একবারে কয়লা হয়ে গেছে’।

পৌষের কনকনে শীত; ঠাণ্ডায় মানুষ ঘরে লেপ-কাঁথার ভিতরেও টিকতে পারেনা। পৌষ-মাঘের এমনি শীতে আন্দর বাড়ির পুকুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনো একটানা ক’দিন পানিতে ডুবে থাকতেন। বাড়ির পশ্চিমে লোহার খালেও কখনো কখনো নাক দেখিয়ে পড়ে রয়েছেন। ছায়া ঢাকা ঐ খালে দিন দুপুরেও অত্যধিক ঠাণ্ডার দরুণ কেউ নামতে চায় না। দেহকে কনকনে শীতের ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে তিনি কি নিজ ক্রোধের আগুন নিঃশেষ করেছিলেন? নাকি নিয়েছেন স্রষ্টার সর্বব্যাপী জ্ঞানের শিক্ষা! যেহেতু কুরআনের ঘোষণা; “তিনি (আল্লাহ্) জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জিনিসে ব্যপ্ত রয়েছেন” (কুরআন ২০ : ৯৮ সূরা তোয়াহা)। অত্যধিক ঠাণ্ডায় শরীর ফ্যাকাশে সাদা হয়ে যেতো। পরপর কয়েকটি শীতকাল তিনি এমনি কষ্টকর সাধনা করেন।

হযরত সাহেব কেবলার খাদেম ও খলিফা চন্দনাইশ নিবাসী হযরত আল্লামা মুহাম্মদ নুরুচ্ছাফা (রহ.) মাইজভাণ্ডার শরীফ এসে অছিয়ে গাউসুল আযমকে বলেন, হযরতের নির্দেশে আমি জিয়াউল হক মিঞাকে দেখতে এসেছি। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বপ্নে আমাকে বলেছেন, “আমার মিঞার (দেলা ময়না) চিন্তিত হওয়ার কোন হেতু নাই। জিয়াউল হককে সবার জন্য আমি বাতি জ্বালাচ্ছি।”। উল্লেখ্য যে, তখন রিয়াজত-সাধনার ফলে ছেলের চরম শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতার জন্য পিতা অত্যধিক চিন্তিত হয়ে পড়েন।

দুঃসহ কষ্টকর অত্যধিক ভাব-বিভোরতার কোন পরিবর্তন না দেখে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর প্রখ্যাত খাদেম সহর আলী প্রকাশ লক্ষ্মীর বাপ আবেদন জানালে স্বপ্নে বাবা ভাণ্ডারী বলেন, “আমি জিয়াউল হক মিঞা ও সামশুল হুদা মিঞাকে আমার পাঠশালায় ভর্তি করেছি। ওসব তুই বুঝবি না।” মাঘ মাসের দুই তারিখ, ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৬ সাল হযরত কেবলা স্বপ্নে তাঁর পিতাকে নির্দেশ দেন, জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাঁকে অর্পণ করুন।

৯ মাঘ, তেরশ তিয়াত্তর বঙ্গাব্দ। উরস শরিফ উপলক্ষে দেশ-বিদেশ দূর-দূরান্ত হতে বহু লোক এসেছে এবং আরো আসছে। পরদিন দশই মাঘ উরস শরিফের প্রধান অনুষ্ঠান। সকাল এগারটায় রওজা পাক গোসল দেওয়া হয়। হযরত সাহেব কেবলার অছি-স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি-খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী সাহেব স্বপ্নের নির্দেশ পালনে রওজা শরীফ স্মৃতিকক্ষ হতে হলুদ ও খয়েরি

রংয়ের দু'খানা চাদর খাদেম মালেকের দ্বারা আনয়ন করেন। অতঃপর হযরতের পবিত্র গদী শরীফে দু'পা ঝুলিয়ে রওজামুখী হয়ে বসেন। পুত্রকে আনার জন্য দরবারের প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা সৈয়দ মাহফুজুল করিম সাহেবকে পাঠান। তিন দিন হতে যে ঘরের দরজা বন্ধ, মাওলানা সাহেব দরজায় পৌঁছামাত্র তা খোলেন। হযরতের আমানত গ্রহণের জন্য তাঁকে নিতে পাঠিয়েছেন বলে জানালে খুবই শান্তভাবে বলেন, 'আচ্ছা জী'! আমি জানি। একটু অজু করে আসি'। হুজরায় গিয়ে পিতাকে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে একটু দূরে নতজানু হয়ে পিতার মুখোমুখি এমনভাবে বসেন যেন হযরত সাহেব কেবলা ও হযরত বাবা ভাণ্ডারীর রওজা শরীফ পিছনে না পড়ে। হলুদ রংয়ের চাদরটা নিজ গায়ে জড়িয়ে পিতা গুরু গম্ভীর স্বরে বলেন, "হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র মহান আমানত আমার হেফাজতে ছিল, তা আজ আপনাকে অর্পণ করলাম। হেফাজত করবেন।" এ কথা বলে খয়েরি রঙের চাদরখানা নিজ হাতে ছেলের গায়ে পড়িয়ে দেন। ছেলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'আলহামদুলিল্লাহ্'। এ সময়ে হুজরার বারান্দা ও মাঠে উপস্থিত ছিলেন হযরত সাহেব কেবলার খলিফা মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর (রহ.) পুত্র আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, বাঁশখালীর প্রসিদ্ধ জমিদার হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ফটিকছড়ি থানার আজিমনগর গ্রামের এডভোকেট আফসার উদ্দিন চৌধুরী, চট্টগ্রাম শহরের দেওয়ানবাজারের জনাব আরহাম আলী চৌধুরী, বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলীর ড. রুহুল আমিন সিদ্দিকী এবং আরো অনেকে। চাদর পরিয়ে দিলে তাঁর মস্তক ও শরীর হতে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হতে থকে। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক শাহ্ এভাবেই গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। পুত্রের ডায়রীতে পিতা-পুত্র সম্পর্ক যেভাবে বর্ণিতঃ 'মার্চ মাসের ১৫ তারিখ অলিয়ার প্রতি আমার মন নিবিষ্ট (রুজু হয়) ও বাবাকে চিনি বা চিনতে শিখি। ওমারেমা! হেতান (তাঁর) বড় বড় দর্জা (তাজিম) আদব'।

মাইজভাণ্ডার রওজা সংলগ্ন মাঠে লাখো লাখো জনতার মহাসমাবেশ; যেন আরাফাতের মাঠ। সকলের অধীর অপেক্ষা, কবে আসবেন। মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় অপরূপ সাজানো এক মঞ্চ। হঠাৎ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সাহেব। তাঁর হাতে স্বর্ণ ও হীরা খচিত একটি অপূর্ব সুন্দর তাজ। কিছুক্ষণ পর হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে সেখানে আনা হলে হযরত সাহেব কেবলা নিজ হাতেই সে তাজ তাঁর মাথা মোবারকে পরিয়ে দেন। উপস্থিত জনতা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল মুখরিত করে তোলেন। এ স্বপ্ন দেখেন আলহাজ্ব সৈয়দা মোজাহের রাব্বি ১৯৬০ সালে। তিনি নানুপুর নিবাসী পূবালী ব্যাংকের সাবেক মহা-ব্যবস্থাপক এস এম আবু তাহের সাহেবের জননী।

১৯৮০ সালের অক্টোবরের ঘটনা। চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লাহ্ রাজাপুকুর লেইন, শেখ বজলুর রহমান কোম্পানীর বাসা। ফটিকছড়ি থানার বক্তপুর নিবাসী সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ ও দৌলতপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে চেয়ে হযরত জিয়াউল হক

মাইজভাণ্ডারী শাহ্ দীপ্তকণ্ঠে তিনবার করে বলেন, 'আমি হযরত সাহেব কেবলা, আমাকে হযরতের চেয়ে কম মনে করোনা'।

মৃতপ্রায় যে শিশু হযরত বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র হাতের জলপানে পুনঃজীবন লাভ করেছিলেন, কালে কঠোর সাধনায় রূহে রহমানিতে উন্নীত হয়ে লাভ করেন সে মহান অলির কুত্‌বিয়াতের পূর্ণ ফয়েজ বা অনুগ্রহ। মাইজভাণ্ডারী দর্শনের অথরিটি জ্ঞান ভাণ্ডার হযরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিকট হতে লাভ করেন ইত্তেহাদী ফয়েজের (সার্বিক অনুগ্রহ) পরিপূর্ণ দান। এ তিন মহান অলি-আল্লাহ্‌র ফয়েজ বরকতের অধিকারী হয়ে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী শাহ্ মহান তিনে মহাশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হন।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও দর্শনই তাঁর চর্চিত দর্শন। এটি সার্বজনীন দর্শন। এই দর্শনের একটি শক্ত ভিত্তি আছে।

"আমি (আল্লাহ্) প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্ব-জাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছি, যেন তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ বর্ণনা করতে পারে"। (১৪:৪ সূরা ইব্রাহিম)। পণ্ডিতগণের মতে বাঙলা সভ্যতা-সংস্কৃতির বয়স ৬০০০ বছর হলেও ভাষার বয়স তত নয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০ হতে ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলা মুখের ভাষা অর্থাৎ কথ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। চর্যাপদ বৌদ্ধ দোঁহার লিখিত রূপ পাওয়া যায় ৯০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। চর্যাপদ, দোঁহা ও পুঁথির ধাপ পেরিয়ে কবিতা ও গদ্যসহ বাংলা ভাষা পূর্ণতা লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বেলায়েত জগতে এমনি সময়ে আবির্ভাব ঘটে বাঙালি জাতির এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬ খ্রিঃ)। তিনি কাদেরীয়া ত্বরিকায় বায়াত হলেও ঢোলক, জুড়ি, হারমোনিয়াম ও সঙ্গীতসহ সামাকে ত্বরিকাভুক্ত করে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রবর্তন করেন। তাছাড়া চরিত্র-শুদ্ধি ও রূহানী উরুজের (উন্নতি) জন্য সপ্ত-কর্ম পদ্ধতি নামে একটি দর্শনও এই ত্বরিকাভুক্ত করেন। তৌহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী যে কোন জাতি-ধর্মের মানুষ এই দর্শন অনুসরণের মাধ্যমে শুধু স্রষ্টা অনুরাগ নয়, স্রষ্টা মিলনেও ধন্য হতে পারেন। তাঁর ফয়েজ প্রাপ্তদের মধ্যে মুসলমান ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানও রয়েছেন। এই উপ-মহাদেশসহ বার্মা, চীন, অস্ট্রেলিয়া হতে সুদূর আরব, ইরাক পর্যন্ত তাঁর খলিফাদের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। সে সব স্থানে তাঁদের মাজারও রয়েছে।

যুগে যুগে মর্যাদাবান নবী ও অলিরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব মূলে যে সব নেয়ামত পেয়ে থাকেন তা নিজেরাই প্রকাশ-প্রচার করেন। বাঙালি জাতির মহান মর্যাদাবান অলি আল্লাহ্ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঘোষণা করেন, "হাসর ময়দানে রাসূলুল্লাহ্‌র লেওয়ায়ে আহমদী (আহমদী পতাকা) উড়িয়ে আমিই প্রথম বলবো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (অর্থ–আল্লাহ্ই একমাত্র প্রভু)। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তৌহিদবাদী সকল মানুষের মুক্তির এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা ইতোপূর্বে কোন কালে আর কেউ করেন নাই। অতীতের নবীরা যখন নিজেদের পরিত্রাণের জন্য 'নফ্‌সি নফ্‌সি ফুকারিবেন', তখন বাঙালি

জাতির এই অগ্রনায়ক শুধু নিজেকে নয়, সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহাসমাবেশে গোটা বাঙালি জাতিকেও মহিমান্বিত করবেন।

মাইজভাণ্ডারী ঘরানার আরেক মহান অলি আল্লাহ্ গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী ছিলেন আত্মভোলা মগ্নচৈতন্যের সম্রাট। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র সত্তায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জজব ও সলুক এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মগ্নচৈতন্যের সম্মিলন ঘটেছিল। মহামহিম আল্লাহ্ ও রাসূলের (দ.) পক্ষ হতে তিনি জগত-জীবনের কল্যাণকর যে নেয়ামতি শক্তি অর্জন করেন, তাঁর বিভিন্ন বাণীতে সে সব প্রকাশিত। তাঁর ক'টি বাণী–

* "রাহ্মাতুল্লিল আলামিন রাসূলের রহমতের সীমা জুড়ে আমার বেলায়তি কর্মক্ষমতা।"
* "হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর, সব সমস্যা মিটে যাবে"।
* "আমার দরবার আন্তর্জাতিক প্রশাসন অফিস, যেখান থেকে এ বিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত"।
* "মাইজভাণ্ডার শরীফ হায়াতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার।"
* "চাকুরীর প্রমোশন, ব্যবসায় উন্নতি, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, পরিবারের শান্তি, দুঃসহ রোগ মুক্তি, মান-সম্মান-সম্পদ, দুনিয়াবী সব কিছুর জন্য একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে আমার ঘেরা-বেড়াকে বলে গেলেও কাজ হবে।"
* "আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস-আল্লাহ্র ঘর, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র।"
* "ভয়, বিশ্বাস ও আদবের সাথে যারা আমার দরবারের ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করবে, সকলে মুরিদ।"
* "আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার এই করুণাধারা জীবন-মরণ-হাসর পর্যন্ত জারী থাকবে।"

'শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি কারামতের তাৎপর্য:

সরকারের শান্তি ও স্থিতি: ১৯৮৬ সালে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সরকারের স্থিতির জন্য দোয়া চাইলে বলেন, "সন্তানের কষ্ট হলে বাবা-মারও কষ্ট হয়। জনগণ সরকারের সন্তানতুল্য। জনগণের সুখ শান্তিতেই সরকারের শান্তি ও স্থিতি।" প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী টিএন্ডটি বোর্ডের মহাপরিচালককে পরিচয় করিয়ে দিলে বলেন, 'আমার এখানে কি একটি টেলিফোন দিতে পারবেন'? 'এখানে একচেঞ্জ নাই, তাই সম্ভব হবে না', উত্তর দেন মহা-পরিচালক। তিনি পুনঃপ্রশ্ন করেন, 'একচেঞ্জ ছাড়া হয়না'? ডিজি উত্তর দেন, না হয় না। অতঃপর শাহানশাহ্ বাবাজান 'হো' করে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। সেই 'হো' এর বাস্তবায়ন তার সংযোগ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় ৫০/৬০ কোটি মানুষের হাতে হাতে এখন সেলুলার টেলিফোন।

জগত-জীবনের অনিঃশেষ কল্যাণ বিধান করে ১৯৮৮ সালের ১৩ অক্টোবর ২৬ আশ্বিন ১ রবিউল আউয়াল তিনি মহামহিম আল্লাহ্‌র অনন্ত আনন্দ-মিলনে ধন্য হন। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলায় বিরচিত তাঁর রওজার স্থাপত্য নান্দনিকতা। সকল ধর্মের কল্যাণ প্রত্যাশি মানুষের ভীড়ে নিত্য মুখরিত তাঁর প্রেম বাগান-রওজা শরীফ। তাঁর একমাত্র পুত্র রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ.) কে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী রেখে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে তিনি যোগ্যতার সাথে দরবারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘায়ু নসীব করুন। আমিন!

জামাল আহমদ সিকদার
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, এন্তেজামিয়া কমিটি, গাউসিয়া হক মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক।

মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক মহাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র গাউসে মাইজভাণ্ডারীর প্রথম খলিফা, কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী (রহ.)

শেখ আবু মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফারুকী

বেলায়েত হল নবুয়তের প্রতিবিম্ব বা স্থলাভিষিক্ত কার্যপদ্ধতি। সেই হিসেবে বেলায়েতপ্রাপ্ত ওলামা-ই কিরাম (জাহেরী-বাতেনীজ্ঞানে সমৃদ্ধ অলিগণ) নবীদের 'ওরাছাত' বা উত্তরাধিকারী প্রতিনিধি। সমস্ত ফজিলত, রহমত ও ফয়ুজাতের কেন্দ্রস্থল মদীনা মনোয়ারা থেকে বেলায়েতের করুণাধারা বিভিন্ন ত্বরিকা, উপ-ত্বরিকার মাধ্যমে সারাবিশ্বে প্রবহমান, যার কল্যাণকর প্রভাবে প্রতি যুগ বা শতাব্দীতে আউলিয়া-ই কেরামগণ গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক পদবী ধারণ করে মানবমণ্ডলীর 'সিরাতুল মুস্তাকিম' তথা সার্বিক মুক্তির দিক নির্দেশনাকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত। আবার সময় সময় এ সমস্ত অলি-আল্লাহ্‌র চাইতে আরো শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন কিছু অলি আল্লাহ্‌র শুভাগমণ হয়, যারা নির্দিষ্ট স্থান ও সময়সীমার আওতাভুক্ত না থেকে সর্বকালের সমগ্র সৃষ্টির জন্যে স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকেন। হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন অলিদের অন্যতম। তিনি হযরত রাসূলে করিম (দ) কর্তৃক 'বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী' কারুকার্যখচিত গাউসিয়তের মুকুটপ্রাপ্তির মাধ্যমে অলিকুল সম্রাটের সিংহাসনে সমাসীন।

হযরত গাউসে পাক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিশ্ব মানবতার কল্যাণে দিগ-দিগন্তরে তাঁর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকতের প্রসার ও গাউসিয়তের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে অনেক কামেলে মোকাম্মেল প্রতিনিধি সৃজন করেছেন। তন্মধ্যে হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী হযরত আকদসের প্রথম অনুগ্রহভাজন খলিফা যিনি হযরত কেবলা কাবার বেলায়তে ওজমার বিশেষ করুণাধারায় সিক্ত হয়ে হুবহু তাঁর (হযরতের) পবিত্র চেহেরা অবয়বতা প্রাপ্তির মাধ্যমে স্থলাভিষিক্ত গদীনশীন হওয়ার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদত্ত হল:

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল-ফারুকী বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত চরণদ্বীপ নামক গ্রামে ১২৭০ হিজরী মোতাবেক ১২৫৯ বাংলার ৭ মাঘ ১৮৫২, ২১ জানুয়ারী বুধবার শুভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রদ্ধাষ্পদ পিতার নাম শেখ মোহাম্মদ মাজম ফারুকী এবং স্নেহময়ী মাতার নাম মোসাম্মৎ জয়নাব বিবি। বংশগত সজরা মোতাবেক তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর বংশধারার উত্তরসূরী।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

মাওলানা শাহ্ অছিয়র রহমান চরণদ্বীপি (ক.) শৈশবকালীন শিক্ষা সমাপন করে ১২৮০ হিজরী সনে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনার্থে বোয়ালখালী থানার হাওলা নিবাসী মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আতাহার আলী সাহেবের নিকট গমন করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনি ইলমের মৌলিক শিক্ষা অর্জন করেন। মাওলানা সৈয়দ আতাহার আলী সাহেব একজন কশ্‌ফধারী আলেম ছিলেন। তিনি অতি ছোট বয়সে মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপির (ক.) খোদাভীতি, পরহেজগারী, আদব-আখলাক দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে অন্যান্য ছাত্রদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "তোমরা আমার ছাত্রদের মধ্য হতে 'অছিয়র রহমান' ভবিষ্যতে একজন কামিল অলি উল্লাহ্ হবেন এবং তাঁর ফয়ুজাত ও হেদায়েতের আলোকে এ দেশবাসী উপকৃত হবে"। দ্বীনি শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ করে তিনি ১২৮৫ হিজরী সনে চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং তথায় জামাতে দুয়াম পর্যন্ত লেখা-পড়া করেন। অতঃপর তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১২৯০ হিজরী সনে উক্ত মাদ্‌রাসা হতে জামাতে উলা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসার সুযোগ্য মোহাদ্দিস মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ ছফিউল্লাহ্ (রহ.) সাহেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আরো পাঁচ বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন এবং ১২৯৫ হিজরী সনে মাদ্‌রাসা স্তরের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন।

মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপি (ক.) ১২৯৬ হিজরী সনে আলীগড় জামেউল উলুম মাদ্‌রাসায় প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং তথায় দুই বৎসরকাল প্রশংসার সাথে শিক্ষাদান করে তথাকার ছাত্র-শিক্ষকের যথেষ্ট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

হযরত রাসূলে করিম (দ.) ও গাউসে মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্বপ্নে দর্শন লাভ

মাওলানা শাহ চরণদ্বীপি (ক.) আলীগড় মাদ্‌রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন একদা এক শুভ রাত্রিতে সরোয়ারে কায়েনাত হযরত রাসূলে পাক (দ.) তাঁকে দর্শন দান ও ইরশাদ করেন, "প্রিয় বৎস! আমি তোমার জন্যে মনোরম সুরত পাঠিয়েছি। আমার হাবীব গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়েতের 'প্রথম দ্বার' স্বরূপ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও তা নির্বাহ কর। মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা হতে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।" এরূপ শুভ প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর পর কর্মস্থল থেকে বিদায় গ্রহণপূর্বক তিনি ১২৯৮ হিজরী সনে বাড়িতে চলে আসেন। বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় আর এক শুভ রাত্রিতে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করে বলেন, "বৎস! আমি তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। আমার প্রজ্জলিত জ্যোতির্ময় প্রদীপের সাথে মিশে একাত্ম হয়ে যাও। আর প্রেম ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করে নিজে ধন্য হও এবং তা বিতরণ করে পাপ তিমিরাচ্ছন্ন মানবাত্মাকে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করে তোল।" স্বপ্নে দৃষ্ট হযরত রাসূলে করিম (দ.) এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মোহন জ্যোতির্ময় আকৃতি তিনি আপন মানসপটে ধারণ করে রাখলেন।

বায়াত গ্রহণ ও প্রথম খলিফার পদ লাভ

মোবারক স্বপ্নদ্বয় দর্শনের পর থেকে তাঁর হৃদয়-মনে প্রচণ্ড আনচানভাব ও অস্থিরতার উদ্ভব হয়। তিনি পরদিন প্রাতে মাইজভাণ্ডার শরীফ গমণপূর্বক গাউসে পাকের খেদমতে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নিজকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পন করে দেন। প্রথমে উভয়ের মধ্যে কিছু রহস্যময় বাক্য বিনিময় হয়। অতঃপর হযরত আকদস (ক.) তাঁকে নিজ মোবারক হস্তে বায়াত করিয়ে কিছু মিষ্টি হালুয়া ও শরবত পান করিয়ে দেন। এতে মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপির প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক প্রেরণার (হাল-জজ্বা) উদ্ভব হয়। হৃদয়-মানস আলোড়িত হয়ে তিনি যেন এক নবজীবন লাভ করেন।

মুর্শিদ কেবলায়ে আলমের নির্দেশে তিনি দু'বৎসরকাল সীমাহীন প্রেমপূর্ণ ইবাদত ও রিয়াজতের মাধ্যমে পবিত্রতা ও যোগ্যতা হাসিল করে ১৩০০ হিজরী সনে স্বীয় মুর্শিদ সমীপে উপস্থিত হলে তিনি একখানা চাদর মোবারক তাঁর আপাদমস্তকে পরিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রথম খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

কঠোর রিয়াজত ও স্থলাভিষিক্ত গদীনশীন

খেলাফত লাভ করার পর আরো যোগ্যতা ও পূর্ণতা হাসিলের জন্যে তিনি পাহাড়, পর্বত ও দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে এবং সমতল ভূমির বিভিন্ন মসজিদ, মাজার ও খানকাহ্য় কষ্টকর ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। বার্মার আকিয়াবের পর্বতমালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেয়াং এর পাহাড়ে সফরের সময়ে সংঘটিত তাঁর অনেকে বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঐ সমস্ত এলাকার অধিবাসীদের কাছে এখনো কিংবদন্তি হয়ে আছে। এভাবে তিনি একাদিক্রমে প্রায় ১০ বৎসর অবিশ্রান্ত সাধনায় কামিয়াবি লাভ করে কামালিয়াতের উচ্চতম মোকামসমূহ হাসিল পূর্বক ১৩১১ সনে স্বীয় মুর্শিদে পাক হতে ষোল আনা ফয়েজ ও পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক নেয়ামতের নমুনা স্বরূপ একটি এক টাকা মূল্যমানের রৌপ্য মুদ্রা লাভ করেন এবং নিজ বাড়িতে স্থলাভিষিক্ত গদীনশীন হওয়ার নির্দেশপ্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য, হযরত কেবলায়ে আলমের জাহেরী জিন্দেগীতে তিনিই একমাত্র প্রথম গদীর হুকুমপ্রাপ্ত খলিফা। বাড়িতে এসে গদীতে উপবেশন করার পর ১৩/১৪ বৎসর যাবৎ জাহেরীভাবে দরবার শরীফে যাননি। হযরত কেবলা কাবার সাথে আত্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে ত্বরিকত বিষয়ক দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড নির্বাহ করতেন। একমাত্র হযরত কেবলা কাবার ওফাতের ১৬/১৭ দিন পূর্বে অন্তিম ও জরুরী সাক্ষাতের জন্য দরবারে পাকে গমন করেন। [সূত্রঃ মাইজভাণ্ডার শরীফ থেকে প্রকাশিত 'হযরতের জীবনী ও কারামত' এর পরিশিষ্টাংশ ও "আয়নায়ে বারী" ৩২৭-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপি (ক.) সম্পর্কে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বাণী

মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপির (ক.) কামালিয়াত সম্পর্কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বিভিন্ন মূল্যবান বাণী বা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি একদা মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপিকে বলেন, "তুমি হলে আমার সিদ্দিকে আকবর। তুমি আমার ত্বরিকার ও গাউসিয়াত ক্ষমতায় সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) আসন লাভ করেছ।"

আবার গাউসে পাক মাইজভাণ্ডারী তাঁর অধিকাংশ খলিফা ও ভক্ত-অনুরক্তদেরকে প্রায়শঃ বলতেন, "আমি মাইজভাণ্ডারে ডুব দিয়ে কর্ণফুলী (কাইছা) নদীর দক্ষিণ তীরে চরণদ্বীপ গ্রামে উঠেছি এবং তথায় একখানা মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমার মসজিদে নামায পড়লে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে।" হযরত কেবলা মাইজভাণ্ডারীর উক্ত রূপক কালাম মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপির (ক.) প্রতি স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতা ও খেলাফত প্রদানই বোধগম্য হয়।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অবয়বতা লাভ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বেলায়তে ওজমার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো ফয়েজে ইত্তেহাদী। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী তাঁর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত পরিপূর্ণ 'ইত্তেহাদী ফয়েজ' মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপিকে প্রদানের মাধ্যমে তাঁর চেহারা মোবারকের পরিপূর্ণ অবয়বতা ও আকৃতি দান করেন, যার দরুন হযরত কেবলার নৈকট্যপ্রাপ্ত মাশায়েখগণও মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপিকে (ক.) পরখ করতে পারতেন না। এইরূপ একটি ঘটনা অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) "হযরত কেবলার জীবনী ও কেরামত"-এর পরিশিষ্টাংশে উল্লেখ করেছেন। হযরত কেবলা কাবার জাহেরী জীবিত থাকাকালীন অধিকাংশ খলিফা তাঁর আদেশ ও কালাম মতে চরণদ্বীপের 'রূপক মসজিদ' বা মৌলানা শাহ্ চরণদ্বীপির সাক্ষাত ও দোয়ার জন্য চরণদ্বীপ দরবার শরীফে আসতেন। এমনকি হযরতের ওফাতের পরও তাঁর বড় বড় খলিফা ও মাশায়েখগণ চরণদ্বীপ এসে হযরতের চেহারা মোবারকের অবয়ব সৌন্দর্য্য অবলোকন করে তাদের রূহানি পিপাসা নিবৃত্ত করতেন। জনাব গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতুবুল আকতাব সোলতানুল মাহ্‌বুবীন হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) সায়ের অবস্থায় এবং ছোট মাওলানা কুতুবুল ইরশাদ হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.)ও রূহানী সাক্ষাতের জন্য চরণদ্বীপ দরবার শরীফে এসেছেন। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) হুজুর আমার চাক্ষুষ দেখা মতে মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপির মেঝ শাহজাদার ওফাত পূর্ববর্তী সময়ে দুইবার চরণদ্বীপ দরবার শরীফে তশরিফ এনেছিলেন।

বেলায়তী ক্ষমতায় মানব সেবা

মাওলানা শাহ্ চরণদ্বীপি (ক.) কামালিয়াতের উচ্চতম সোপানে উপনীত হলে তাঁর বুজুর্গীয়তের সুখ্যাতি দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অসংখ্য হাজতী ও মুক্তিকামী জনতা তাঁর দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। তাঁর অসংখ্য কারামতের কথা এখনো এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তিভরে আলোচিত হয়। তাঁর সান্নিধ্যে আসা দুনিয়াবী লোভ-লালসার বশবর্তী লোকদের জাগতিক উদ্দেশ্য পূরণের চাইতে তিনি তাদের পরকালীন মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে উদ্বুদ্ধ করাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। অনেক আলেম-ফাজেল, জ্ঞানী-গুণী তাঁর নৈকট্যে এসে সাধারণ মানবীয় স্তর থেকে উচ্চ মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন কামিল অলিতে পরিণত হন ও প্রতিনিধিত্ব লাভে ধন্য হন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা শাহ্ তাজুল ইসলাম হাশিমপুরী (রহ.) চন্দনাইশ, মাওলানা শাহ্ হামিদুল্লাহ্ (রহ.) রাউজান, মাওলানা সৈয়দ

সিরাজুল হক (রহ.) রাঙ্গুনীয়া, মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী (রহ.) রাঙ্গুনীয়া, মৌলভী শাহ্ আবদুল জলিল (রহ.) গোমদন্ডী অন্যতম।

ওফাত

পবিত্র ইসলাম ও ত্বরিকতের গুরু দায়িত্ব পালন ও মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধনে সফলকাম হয়ে ১৩২৭ বাংলার ১২ ভাদ্র, ১৯২০, ২৯ আগস্ট, ১৩৩৮ হিজরীর ১২ জিলহজ্ব কুতুবুল আকতাব, বিল বিরাসতে গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী (ক.) ইহজাগতিক লীলা সংবরণ করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করেন। মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ করুণাবারি তাঁর পবিত্র আত্মায় বর্ষিত হোক। আমিন!

১. হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ অছিয়র রহমান আল ফারুকী (ক.) হলেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রথম খলিফা। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারের গোড়ার দিকে তৎকালীন আলেম সমাজের বিরূপ ও কঠোর সমালোচনার সময়ে তিনি গাউসে মাইজভাণ্ডারীর ত্বরিকা সর্বপ্রথম কবুল করে তা প্রচারে কার্যকর অবদান রাখেন। তাই মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় তাঁর মর্যাদা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ন্যায়।

২. তিনি ফারুকে আযম হযরত সৈয়দেনা ওমর ফারুক (রা.)-এর পবিত্র বংশধারার সুযোগ্য উত্তরসূরী।

৩. তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হতে খেলাফতের নমুনাস্বরূপ একখানি চাদর মোবারক ও একটি এক টাকা (ষোল আনা) মূল্যমানের রৌপ্য মুদ্রা তবর্রুকাত হিসাবে প্রাপ্ত খলিফা।

৪. তিনি হযরত কেবলা কাবার (ক.) জাহেরী জিন্দেগীতে খলিফাদের মধ্যে একমাত্র গদীর হুকুমপ্রাপ্ত খলিফা।

৫. তিনি হযরত কেবলা কাবার (ক.) বেলায়তে ওজমার সর্বোচ্চ নেয়ামত "ইত্তেহাদী ফয়েজ" প্রাপ্তিতে হযরত কেবলা কাবার দেহ মোবারক ও সুরত আকৃতির পূর্ণাঙ্গ অবয়বতার অধিকারী।

শেখ আবু মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ফারুকী: আওলাদে খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), চরণদ্বীপ দরবার শরীফ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বিশিষ্ট খলিফা, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার যথার্থতার পক্ষে শরয়ী দলিল প্রদানকারী ও অতন্দ্র প্রহরী, ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদদের অন্যতম, সুন্নীয়তের সর্ববৃহৎ স্তম্ভ আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র

শাহ্জাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফুল হক

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) ছিলেন আল্লামা গাজী শেরে বাংলার (রহ.) ভাষায় আলেমগণের ইমাম, সর্বাত্মক মর্যাদাবান গণ কর্তৃক অনুসৃত, খোদা পরিচয় লাভকারীদের গৌরব, তর্কশাস্ত্রবিদগণের সর্দার, শরয়ী দলিল বিশারদ গণের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, সার্বজনীন নেতৃস্থানীয় আলেম, মহা মর্যাদাশালী, দূরদর্শী জ্ঞানী, মর্যাদাশালী তত্ত্বজ্ঞানী, সূক্ষ্মজ্ঞানের অতল সাগর, তীক্ষ্ম জ্ঞানের তরঙ্গমালা, খ্যাতনামা মশায়েখগণের আশ্রয় কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞগণের সনদ, তত্ত্বজ্ঞানীদের মুকুট, লিখনী ও গ্রন্থাগার সম্রাট, গণ্যমান্যগণের দলিল, ইসলাম জাহানের শায়খ বা ধর্মগুরু।

তিনি চট্টগ্রাম জিলার হাটহাজারী থানার উত্তরপ্রান্তে ফরহাদাবাদ নামক একটি ছোট্ট গ্রামে কাজী ও সৈয়দ বংশীয় এক প্রখ্যাত আলেম পরিবারে ১২৭১ বাংলা মোতাবেক ১২৬৩ হিজরী, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে স্বগ্রামে এক শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুজুর্গ পিতার নাম হযরত আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম (রহ.)। তাঁর পিতা আলহাজ্ব আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম (রহ.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন ও আশেকে রাসূল (দ.)। তিনি মৌলুদ শরীফ বিষয়ক সরকারে-দো-আলম রাহমাতুল্লীল আলামীন হযরত আহমদ মুজতাবা, মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর শানে প্রায় সতরশত হৃদয়গ্রাহী ফার্সী ও আরবী শ্লোক সম্বলিত 'নজমে দিল কোশা ফি মিলাদে মোস্তফা' শীর্ষক কিতাব রচনা করেন, যা সে সময়কার সুন্নী মুসলমানদের হৃদয়ে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। খাতেমুল আউলিয়া গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) যিনি আল্লাহ্তা'লার জগতসমূহে গাউসুল আযম রূপে নিয়োজিত এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মাহবুবিয়ত তথা প্রেমাস্পদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ২২ তারিখে তাঁকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে মৌলুদ শরীফ পড়াবার জন্য দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর [অর্থাৎ আল্লামা সৈয়দ আবদুল করিম (রহ.)] উপস্থাপনায় পরিচালিত মৌলুদ শরীফ শ্রবণ করতেন। তাঁর মাতার নাম সৈয়দা নসিমা খাতুন, যিনি হাটহাজারী থানার বুড়িশ্চর মৌজার সৈয়দ বংশীয় ছিলেন।

বাল্যজীবন ও জাহেরী ইলম অর্জন: সৈয়দ আমিনুল হকের বয়স চার বৎসর অতিবাহিত হলে তাঁর বুজুর্গ পিতা তাঁকে কালামুল্লাহ্র সবক দেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পিতার নিকট সহিভাবে

পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কেও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর তাঁকে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি চট্টগ্রাম শহরের তৎকালীন সরকারী মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় পাঠ্য অবস্থা থেকেই তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যুগশ্রেষ্ঠ মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের নজরে করমের বদৌলতে ব্যতিক্রমধর্মী প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে শুরু করেন। মোহসেনীয়া মাদ্রাসায় ফাজিল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াকালীন এক রাত্রে তিনি চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ অলি আল্লাহ্ হযরত আমানত শাহ্ (রহ.)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত করতে যান। তথায় মাজার পার্শ্বস্থ কুল গাছের নীচে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। নিদ্রামগ্ন অবস্থায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দিব্যি দেখতে পেলেনচ মাজার শরীফের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ কুল গাছ থেকে একটি কুল ছিঁড়ে তাঁর মুখে পুরে দিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছুটে গেল। জাগ্রত হওয়ার পর তথাকার কুল গাছ থেকে তাঁর সামনে টস করে একটি বে-মৌসুমী পাকা কুল পড়ল। তিনি অজু করে কুলটি খেয়ে ফেললেন। পরদিন রাত্রে তিনি হযরত মিসকিন শাহ্ (রহ.)-এর মাজার শরীফে গিয়ে তাঁর অতি পরিচিত এক বুজুর্গ কম্বলি শাহ্কে কম্বল আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি কম্বলী শাহ্কে মৃত বলে ধারণা করে তথায় কুরআন পাঠে রাত্রি অতিবাহিত করেন। অতঃপর সকালে নামাযের আযান শুনামাত্রই দেখতে পেলেন কম্বলি শাহ্ আল্লাহু আকবর বলে উঠে বসে গেছেন। তিনি এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে কম্বলি শাহ্'র মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কম্বলি শাহ্ তাঁকে বললেন, গত রাত্রে আমানত শাহ্ তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন, আবার এখানে কেন এসেছে। অতঃপর তাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আমাকে একটি কম্বল দিও। তিনি তথা হতে নিজ বাসায় চলে গেলেন। দিবাগত রাত্রে বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে তাঁর নিদ্রা এসে গেল। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, হযরত আমানত শাহ্ (রহ.) তাঁর পাশে বসে কিতাবের পর কিতাব উল্টাচ্ছেন এবং তিনি পড়ে যাচ্ছেন। এই পড়ার যেন শেষ নেই। এরপর তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরজা খুলে গেল অর্থাৎ তিনি ইলমে লদুনী প্রাপ্ত হন। এরপর থেকে মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষকগণ কোন মাস্য়ালা নিয়ে আটকে গেলে তিনি এর সুন্দর সমাধান দিতেন। শিক্ষকগণ তাঁর এই ধরনের প্রতিভা দেখে তাঁকে 'মুফ্তী আমিন' অভিধায় আখ্যায়িত করতে লাগলেন। অতঃপর যথারীতি মোহসেনীয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন তিনি। ইলমে কুরআন, ইলমে হাদিস, উসুলে হাদিস, ফিকাহ্, সব মযহাবের উসুলে ফিকাহ্, তাফ্সির, মানতিক, হেকমত, বালাগত, আকাঈদ, ফিলসফা ও ফরায়েজ প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতঃপর তিনি স্বগ্রামে নিজ বাড়িতে এসে তাঁর বুজুর্গ পিতার সাথে ধর্মীয় বিষয়াদির উপর আরো অধিক জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। এ সময়ে তিনি স্বামী-স্ত্রীর তালাক সম্পর্কীয় ফতোয়া 'গায়তুত্ তাহ্ক্বীক ফী মা ইয়াতা-আল্কুবিহী তালা-কুত্ তালীক' নামে একটি উচ্চাংগের কিতাব রচনা করেন। তা দেখে তৎকালীন প্রখ্যাত মুফ্তী আল্লামা ফয়েজ উল্লাহ্ সাহেব তাঁর

ইলমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মুফ্‌তী ফয়েজউল্লা সাহেব ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত জাহাপুর গ্রামের গরীব উল্লাহ্‌ মুফ্‌তী বাড়ীর প্রখ্যাত মুফ্‌তী ছিলেন।
ইসলামী জটিল বিষয়াবলীর উপর তাঁর ফতোয়া প্রণয়নে দক্ষতা, মোনাজারা, ফরায়েজ, আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা ভাষায় ছন্দে, পদ্য এবং গদ্য ও লিখনি পদ্ধতির দক্ষতা দেখে তাঁর সমসাময়িকগণ তাঁকে যোগ্য মর্যাদা দিতে লাগলেন। আলেম ও আওয়াম সমাজের নিকট তিনি 'বড়' মৌলভী সাহেব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ইলমে বাতেন তথা কামালিয়াত এবং খেলাফত লাভঃ জাহেরী দ্বীনি ইলম শিক্ষা সমাপ্তির পর ইলমে তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ব্যাপারে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) খাতেমুল অলি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর অন্তর চক্ষুতে ধরা পড়লেন এবং স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে তাঁর খেদমতে গিয়ে রূহানী ফয়েজ লাভ করেন। ফলে আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.)-এর ধ্যান-ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। হযরত ওমর ফারুক (রা.) যেরূপ ইসলাম ও খাতেমুন্‌ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শেষ তক্‌ খাতেমুন্‌ নবী (দ.)-এর নবুয়তী ও বেলায়তী প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আল্লাহ্‌-রাসূলের নৈকট্য ও রেজামন্দি হাসিল করতঃ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীও প্রথম দিকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বিরোধী থাকলেও শেষ তক খাতেমুল অলি গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খোদাপ্রদত্ত বেলায়তী শক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেমন জগৎ বিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রহ.) তাপসকুল শিরোমনি হযরত শামছুত্‌ তাবরিজের (রহ.) সাহচর্য্যে এসে জাহেরী জ্ঞানের পরিবর্তে বাতেনী জ্ঞান তথা অদৃশ্য খিজরী জ্ঞান লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি হযরত আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদীও খাতেমুল অলি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর সাহচর্য্যে এসে জাহেরী জ্ঞানের পরিবর্তে অদৃশ্য খিজরী জ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রথমে স্বপ্নে, তারপর জাহেরে দর্শন ও সাহচর্য্যে এসেই আমূল পরিবর্তন ঘটে। এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া, বেহতর্‌ আজ সদ সালে তা আত বেরিয়া (মস্‌নবী শরীফ) অর্থাৎ এক মুহূর্ত আউলিয়ার দর্শন লাভ করা শত বৎসরের ত্রুটিহীন (কবুল হওয়া) ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।
অতঃপর আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) হাতে জাহেরীভাবেও বাইআত হন এবং মাইজভাণ্ডার দরবার ও ত্বরিকার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার-প্রসারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করে রীতিমতো প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পড়েন। এতদিন যিনি এই ত্বরিকার ঘোর বিরোধী ছিলেন, এখন তিনিই সেই ত্বরিকার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। দেশ-বিদেশে ওয়ায়েজ মাহফিলে এ ত্বরিকার সুষ্ঠুতার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীস ইজমা-কিয়াসের অকাট্য দলিলাদি পেশ করে আলেম সমাজের নিকট ত্বরিকার বাস্তবরূপ ও সঠিকতা তুলে ধরেন। তখন মাইজভাণ্ডার

দরবার শরীফে প্রচলিত আশেক-ভক্তদের সামা মজলিশ এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সামনে আশেক-ভক্তদের সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ তথা সম্মান প্রদর্শনার্থে সজিদা ইত্যাদি দর্শনে এক শ্রেণীর আলেম ইনকার করতঃ মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে প্রচলিত আধ্যাত্মিক সামা ও সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ তথা সম্মানী সজিদার বিরোধিতা করে বলতে থাকেন যে, 'সামা' মতলক বা শর্তহীনভাবে হারাম, আর সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ তথা সম্মানী সজিদা করা কুফরী, ইলহাদ বা ধর্ম বিরোধী, আবার কেউ কেউ বলেন হারাম। এ কারণে তারা মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আশেকভক্ত তথা অনুসারীদের বিরোধিতা করে স্থানে স্থানে সভা সমাবেশ, ওয়ায়েজ-নসিহতের আয়োজন করে লোকজনকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। আর এ সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন আলেমদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত হয়ে কিছুসংখ্যক লোক মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আশেক-ভক্তদেরকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের জিনিষপত্র কেড়ে নিত, আর মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তদের সমাজচ্যুত করা হতো। এভাবে তারা মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তদেরকে অত্যাচার করে যেতে লাগল। তখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করতঃ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার'-এ বলেন, "আমি যখন দেখলাম, এই ত্বরিকার অনুসারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামে, গঞ্জে, শহরে বিচরণ করছে। এ ত্বরিকা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান নেই, তারা তাদের (অনুসারী) শানে নানারূপ বেয়াদবীমূলক কথা বলছে এবং অনেক সময় তাদের জুলুম-অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে, যেহেতু প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাদের (জুলুমকারীদের) কোন জ্ঞান নেই, ফলে দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তগণ ফ্যাসাদের শিকার হয়েছে। তাছাড়া তখনকার জাহেরী শরীয়তের আলেমগণ মাইজভাণ্ডারী গান-গীতিসহ সমস্ত গান-গীতি শর্তহীনভাবে হারাম-কুফরী প্রভৃতি ফতোয়া প্রদান করে সাধারণ জনগণকে মাইজভাণ্ডারী আশেকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, এ অবস্থায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অনুমতিক্রমে এ মাসআলার ব্যাপারে তথা সামা ও সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ বা সম্মানার্থে সজিদার ব্যাপারে একটি কিতাব রচনা করার ইচ্ছা পোষণ করলাম, যদ্বারা সামা ও সজিদায়ে তাহিয়্যাহ্ যে জায়েয বা বৈধ তা স্পষ্ট হয়ে যায়, যাতে এ বিষয়ে সন্দেহ ও সিদ্ধান্তহীনতা বিদূরিত হয় এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও দ্বিধা কারো কাছে না থাকে, যাতে দানা ও খোসা পরিষ্কার দু'ভাগে বিভক্ত হয়।" অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্পাকের কৃপায় আমি যখন এই কিতাবটি লিখা শেষ করলাম "তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার ফি-দাফ্-ই-শারারাতিল আশরার" নামকরণ করলাম। অতঃপর আমার মোরশেদ বিশ্বঅলি গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ফানা ফিল্লাহ্ বাকা-বিল্লাহ্র সামনে এই সওগাত পেশ করে কিয়দংশ পাঠ করলাম। তিনি শুনে আনন্দিত হলেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, তজ্জন্য আল্লাহ্পাকের শোকরিয়া আদায় করি। এ সময় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আদর করে আমার জন্য খোদায়ী নেয়ামতের ভাণ্ডার খুলে দিলেন।"

উপরে বিবৃত কথাগুলো আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) তাঁর বহুল প্রচারিত কিতাব 'তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার' এ আরবী ভাষায় ও বাংলা পয়ার ছন্দে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, তা হতে দুইটি পয়ার এখানে সন্নিবেশিত করা হলোঃ

দোয়া করিলেন মোরে করিয়া আদর। তাহার উপর করি খোদার শোকর।

এইক্ষণ হযরত গাউসে মাইজভাণ্ডার। আদরেতে খুলিছেন প্রেমের ভাণ্ডার।

এই দুটি পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সময়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে দোয়া করতঃ খোদা প্রদত্ত নেয়ামত দান করেছিলেন অর্থাৎ তাঁকে খেলাফত দান করেছিলেন।

এতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.)-এর ঐকান্তিক ও প্রজ্ঞাপ্রসূত সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ও আস্থাশীল হয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে খলিফা বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং যথারীতি বাইআত করানোর অনুমতিও দেন। তাঁকে খেলাফত প্রদান করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কালাম করেন, "আমার ছয়টি কিতাব থেকে একটি তোমাকে দিলাম। আমার বারটি কাছারি আছে, একটি তোমাকে দিলাম, আমার বারটি সামা বা বাতি আছে, তন্মধ্যে একটি তোমার। আমার বারজন ইমামের একজন তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" [মাছ্ দারু আইওয়ারিল বারী ফি তরজুমাতে গাউসিজ্জমান আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক.)-প্রথম সংস্করণ ২০০৭ খ্রিঃ পৃষ্ঠা ৫৪/৫৫]। এরপর থেকে মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে আশেক-ভক্তবৃন্দের নিকট আল্লামা ফরহাদাবাদী সম্মানিত ও সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

অতঃপর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিশিষ্ট খলিফা কুতুবে ইরশাদী মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (রহ.) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবদ্দশায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৫ অগ্রহায়ণ ওফাতপ্রাপ্ত হন। স্বভাবতই হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (রহ.)কে প্রদত্ত খেলাফত পদটিও শূন্য হয়ে পড়ে। এই শূন্যপদ পূরণ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক একটি আধ্যাত্মিক রহস্যাবৃত ঘটনার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (রহ.)-এর ওফাতের খবর পেয়ে মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ যাওয়ার পথে রোসাংগিরি গ্রামের এক পুকুর পাড়ে হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। কুতুবুল আকতাব ও অদৃশ্য খিজরী জ্ঞানসম্পন্ন অলি হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) আল্লামা ফরহাদাবাদীর (রহ.) ডান হাত ধরে উক্ত পুকুরে নেমে একাধারে সাতবার সাঁতার কাটার পর পুকুর থেকে উঠেন। ভিজা কাপড়ে আল্লামা ফরহাদাবাদী মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গিয়ে পৌঁছেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে পৌঁছার পর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) কে পরনের কাপড়, সেরওয়ানী ও একটি পাগড়ী দিয়ে ভিজা কাপড় পরিবর্তন করতে বলেন। অতঃপর এই বলে হুকুম দিলেন, 'আমিন মিয়ার জানাযা আমিন মিয়াই পড়াবে'। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আদেশে

আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) জানাযার ইমামতি করার সময়ে তিন তক্‌বীর বলার পর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাকী এক তক্‌বীর দিয়ে জানাযার নামায সমাপ্ত করেন। এরপর থেকে মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেলের সমস্ত গুণাবলী আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.)'র মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে।

গাউসে জমান মুজাদ্দিদে দ্বীনোমিল্লাত মুফতীয়ে আযম আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক.) রচিত কিতাব সমূহের নামঃ

১. শাওয়াহিদুল ইবাতালাত ফী তারদীদেমা-ফী-রাফি-উল-ইশ্‌কালাত (এটা সুন্নী মতাবাদ বিরোধী হাটহাজারী মাদ্‌রাসার মৌলভী ফয়জুল্লাহ্ সাহেবের রাফিউল ইশ্‌কালাত নামক কিতাবের রদ বা খণ্ডন)।

২. দাফিউশ্ শোবহাত ফী জাওয়াজিল ইস্তিজারে আলাত ত্বোয়া-আত (ধর্মীয় কাজ করে বিনিময় লওয়া প্রসঙ্গে ফত্‌ওয়া)।

৩. রাফিউল পেশাবী ফি তরদীদে মা-ফি ইশাআতিল ফতাবী (ইহা অনারবী তথা মাতৃভাষায় জুমার খুত্‌বা দান বা অর্থ করা নাজায়েয সম্পর্কে লিখিত ফত্‌ওয়া ইশাআতিল ফতাবীলহানাফীয়্যাহ ফী তাহারীমি খোতবাতিল জুমআ বেগাইরিল আরাবিয়্যাহ কিতাবের রদ বা খণ্ডন)।

৪. মেরআতুল ফান ফী শরহে মোল্লা হাসান (ইহা ইসলামী আইন ও তর্ক শাস্ত্রের স্বনামধন্য কিতাব মোল্লা হাসান এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা)।

৫. তোহ্‌ফাতুল আখ্‌ইয়ার ফী-দাফ-ই-শারারাতিল আশরার (এটা নির্দোষ সামা, সিজদায়ে তাহিয়্যাহ্, পীর মোরশিদের আনুগত্য, বাইআত ও ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কীয় বিস্তারিত ফত্‌ওয়া)।

৬. আত্ তাওজিহাতুল বাহিয়্যাহ্ ফী তারদীদে মা-ফি তাহরীমি সিজ্ দাতুত্ তাহিয়্যাহ্ নামক ফতোয়ার রদ বা খণ্ডনে সিজদায়ে তাহিয়্যাহ্, নির্দোষ সামা প্রভৃতি সম্পর্কীয় ফত্‌ওয়া।

৭. গায়তুত্ তাহক্বীক ফী মা ইয়াতা-আল্লুক বিহীতালা-কুত্ তা'লীক (ইহা স্বামী-স্ত্রীর তালাক্ব সম্পর্কীয় ফতোয়া) প্রভৃতি।

আল্লামা ফরহাদাবাদী (রহ.) ২৭ জিলহজ্ব ১৩৬৩ হিজরী, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫১ বাংলা মোতাবেক ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে রোজ বুধবার, জোহরের সময় উনআশি বছর বয়সে ফরহাদাবাদ দরবার শরীফে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক হতে পর্দা করেন (ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন)। ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আসরের সময় তাঁর একমাত্র পুত্র ও খলিফায়ে আযম আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম (রহ.)-এর ইমামতিতে জানাযার নামায সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাঁকে দাফন করা হয়।

আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রহ.) তাঁর রওজা শরীফের বর্ণনা দিয়ে নিম্নোক্ত শোক গাথা রচনা করেন।

"তর বতশরা বাগে জান্নাত ছাজে আই রব্বে জাহা
ইস্তাজিব ইয়া রব্ব তোফাইালে ছরওয়ারে পয়গম্বরা

আন্দর আঁ ফরহাদাবাদস্ত রওজায়ে পুরনুর উ,
আব হমাপুর ফয়েজে বাশদ দায়ে মান আজ জাতে উ।

অর্থাৎ “হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তাঁর সমাধিস্থলকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন। হে রাব্বুল আলামিন! নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর উসিলায় আমার এ প্রার্থনা কবুল করুন। চট্টগ্রামের ফরহাদাবাদ গ্রামে তাঁর ইরানী রওজা শরীফ অবস্থিত। সর্বদা আমাদের সকলের উপর এ মহান অলি আল্লাহ্‌র রূহানী ফয়ুজাত প্রবহমান থাকুক (দিওয়ানে আজিজ)।” প্রত্যেক বছর ২৭ অগ্রহায়ণ তাঁর পবিত্র উরস শরিফ তাঁর রওজা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

শাহ্‌জাদা মৌলভী সৈয়দ লুৎফুল হক : লেখক ও গবেষক,
ফরহাদাবাদ দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

আমিরুল আউলিয়া সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামান (রহ.)

সৈয়দ ফরিদুল আবছার আমিরী

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রাক প্রতিষ্ঠাতা ইমাম জয়নুল আবেদীন (রা.)-এর বংশধর সৈয়দ কাজী মৌলভী মুহাম্মদ মওলা চাঁন্দ (রহ.)-এর পুত্র আমিরুল আউলিয়া সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামান (ক.)। ১৮৪৫ সালের ১৫ মার্চ, বাংলা ১২৫২ সনের ১ চৈত্র, ১২৬২ হিজরী মোহ্তরমা হালিমা খাতুন ওরফে শাম্ছ (রহ.)-এর কোল জুড়ে জন্ম নেন পটিয়ার এই আধ্যাত্মিক বাদশা।

আল্লাহ্‌র নেক বান্দা হযরত সৈয়দ মওলা চাঁন্দ (রহ.) পারিবারিক ধারা অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতেন। এছাড়া তাঁর সামান্য চাষযোগ্য জমিতে ধান চাষ করে সংসার চালাতেন। তাঁর সহধর্মিনী হালিমা খাতুনের পিতৃ পুরুষগণ ছিলেন পটিয়ার বাহুলি গ্রামের বনেদী বংশীয়। ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে শুনেছিলেন, গর্ভের সন্তান এক মহান আউলিয়া হয়ে পরিবারের মান-মর্যাদা রক্ষা করবেন। সৈয়দ মওলা চাঁন্দ (রহ.) একইভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে একজন বুজুর্গ সন্তান কামনা করতেন। মহান এই সাধকের জন্মের পূর্বেই হালিমা খাতুন এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর শয়ন কক্ষ আলোকিত করে কে যেন ডেকে বলেন, 'আমার দোস্তের নাম রাখবে মোহাম্মদ আমিরুজ্জামান'। তাই সন্তান জন্ম নেয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে আকিকা করে তাঁর নাম রাখা হয় সৈয়দ মুহাম্মদ আমিরুজ্জামান মিয়া।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত পারিবারিকভাবে অক্ষর জ্ঞান অর্জনশেষে ৬ বছর বয়সে স্থানীয় মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র হাদু চৌধুরী মসজিদে হযরত সৈয়দ শরফুদ্দিন মিয়ার তত্ত্বাবধানে পড়া লেখা করেন সৈয়দ আমিরুজ্জামান (ক.)। সেখানে ৪-৫ বছর আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় শিক্ষার্জন শেষে পিতার ইচ্ছায় আরবী ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা নিতে আগ্রহী হলেন। এ সময় পিতা মওলা চাঁন্দ (রহ.) ইন্তিকাল করলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপরও মাতা হালিমা খাতুন আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় তাঁকে তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও আলেম বড়লিয়ার সৈয়দ মওলানা শাহ্ আবদুর রশীদ মিয়ার কাছে পাঠান। সেখানেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন শেষে দস্তবায়ত গ্রহণপূর্বক ইলমে তাসাওউফ অর্জন করেন সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামান (ক.)। এরপর অধিক নেয়ামত লাভের উদ্দেশ্যে রাউজানের কদলপুর গ্রামের মওলানা শাহ্ সুফি আবদুল আজিজ কদলপুরী (রহ.)-এর নিকট গমন করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট বুজুর্গের পরামর্শে পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়স্থ কিপাইন নগরের বিশিষ্ট মজজুবে সালেক অলি-আল্লাহ্ হযরত আজগর শাহ্ (রহ.)-এর নিকট গমন করেন। তাঁর সংস্পর্শে থেকে আন্তরিক পরামর্শে সৈয়দ আমিরুজ্জামান শরণাপন্ন হন ইছাপুরের হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.)। তিন মহান আলেমের সাহচর্যে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

আমিরুল আউলিয়া তিন আলেম-ওলামা ও অলি-বুজুর্গের সঙ্গ শেষে ফিরে আসেন মায়ের কাছে। এ সময় শরীয়ত মোতাবেক বিভিন্ন কাজে তিনি মনোনিবেশ করেন। সারা রাত তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির-আজকারে তাঁর সময় কাটে। সেই মুহূর্তে স্থানীয় মসজিদে ইমাম পদ শূন্য থাকায় স্থানীয় মুরুব্বীরা তাঁকে ইমামতির পদ গ্রহণে বাধ্য করেন। সেখানে তিনি নিয়মিত ইমামতি ও মক্তবে দ্বীনি শিক্ষা দিতে শুরু করেন। স্নেহময়ী মাতা হালিমা খাতুন পরহেজগার পুত্রের সাথে ভ্রাতা আইনুদ্দিনের কন্যা মোহ্তরমা মোসাম্মৎ ওয়ায়েজ খাতুন (রহ.)-এর বিবাহ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মায়ের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বিবাহ করতে সম্মত হন। কিন্তু অকস্মাৎ মাতার ইন্তিকাল ঘটায় তিনি যথারীতি মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময় হাদু চৌধুরী মসজিদটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। একদিন রাতের বেলা মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিক থেকে আসার পথে তিনি আজানের শব্দ শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ মসজিদে প্রবেশ করে অজু শেষে দেখতে পেলেন, সাদা পোশাক পরিহিত অনেক অপরিচিত মুসল্লী নামায আদায় করছেন। শেষ কাতারে শুধু মাত্র একজন মুসল্লীর স্থান খালি দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নামায শেষ করেন। জামাত শেষে সকল মুসল্লী বের হয়ে গেলেও রয়ে গেলেন ইমাম সাহেব এবং তিনি। হযরত আমিরুজ্জামানকে ডেকে ইমাম সাহেব বললেন, যার সন্ধানে এই উম্মাদনা, তাকে পেতে হলে যেতে হবে ইছাপুর। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান ইমাম সাহেব। এরপরই ইছাপুর যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন তিনি। পরদিনই ইছাপুর হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েন হযরত শাহ্ আমিরুজ্জামান (ক.)।

১৮৭৭ সালের কথা। ৩২ বছরের আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হযরত আমিরুজ্জামান দীর্ঘ ৪৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পৌঁছলেন মাহবুবে খোদার রাজদরবার প্রাঙ্গণে। দূর থেকেই তিনি হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কে চিনতে পেরেছেন, যিনি হাদু চৌধুরী জামে মসজিদে ইমামতি করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন ইছাপুর যাওয়ার জন্য। এখানে এসে তিনি হযরত গাউসুল আযমের দস্তে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং মাওলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর প্রায় ছয় মাস মাওলার সেবায় নিয়োজিত থেকে ফিরে আসেন পটিয়ায় নিজ বাড়িতে। মরহুম আম্মাজানের ইচ্ছে পূরণ এবং মামা আইনুদ্দিনের চাপে নতি স্বীকার করে অবশেষে তিনি মামাতো বোন মোসাম্মৎ ওয়ায়েজ খাতুনকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরও স্থানীয় মসজিদে ইমামতি এবং মক্তবে শিক্ষাদান করতেন। মাঝে মাঝে চলে যেতেন মাইজভাণ্ডারে। একসময় তাঁদের সংসারে জন্ম নেয় প্রথম পুত্র সন্তান জানে-আমির হযরত সোলাইমান শাহ্ আমিরী (রহ.)। সংসারে প্রায়ই লেগে থাকতো অভাব-অনটন। আমিরুল আউলিয়ার আনমনা অবস্থা বুঝতে পেরে স্ত্রী তাঁকে মুর্শিদের সেবায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। সেই থেকে তিনি হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর খেদমতে মাইজভাণ্ডারে চলে যান স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে। অপরদিকে স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরে থাকেন মহীয়সী রমনী

ওয়ায়েজ খাতুন (রহ.)। পরবর্তীতে আমিরুল আউলিয়া মোহ্তরমা ফাতেমা খাতুন এবং ১৩ বছরের মোহ্তরমা লা'আলজান বিবিকে বিবাহ করেছিলেন।

মাইজভাণ্ডার শরীফে পীরের দরবারে সৈয়দ পরিবারের সকল কাজ দেখাশুনা করতেন সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামান (ক.)। তাঁর রিয়াজতে সন্তুষ্ট হয়ে হযরত কেবলায়ে আলম তাঁকে 'কালাসোনা' নামে অভিহিত করেছিলেন। হযরত কেবলার চলার পথ থেকে দুর্গন্ধময় ময়লা অপসারণ, নির্দেশ মোতাবেক খেজুর গাছে উঠে কাঁটার স্তুপে লাফ দিয়ে পড়েও অক্ষত থাকা, হযরত কেবলার তলোয়ারের নিচে কোরবানীর উদ্দেশ্যে মাথা নুইয়ে দেয়া, দরবারের মাঠে উত্তপ্ত ডেক্সীর পানিতে ফেলে দেয়ার পর ছোট্ট শিশুর মতো হাত-পা নেড়ে খেলা করা, ১১ বছর বয়সেই সৈয়দ শাহ্ আকবর আউলিয়া (রহ.) কে নিজ স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়াসহ একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আধ্যাত্মিকতার অনন্য উদাহরণ। একদিন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হুজরা শরীফে অবস্থানকালে হুজরার দেয়ালে আঙ্গুলের ইশারায় কি যেন লিখছিলেন! এরপরই তিনি ঘোষণা দিলেন, 'হাম আমিরুজ্জামান মিয়াকো খেলাফত দে দিয়া'। মুহূর্তের মধ্যে তিনবার একই কথা উচ্চারণ করলেন হযরত কেবলায়ে আলম (ক.)। সেদিনই প্রিয় মুর্শিদের হুকুমে পটিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন শাহ্ সাহেব আমিরুল আউলিয়া। ১৮৮৮ সালে ৪৩ বছর বয়সে সেখানে দরবার প্রতিষ্ঠা করে তিনি গদীনশীন হন।

মাইজভাণ্ডার থেকে আসার পর নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে তিনি জিকির করতেন। এ সময় অনেকে তাঁর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন; এমনকি নিজ বড় ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীও তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ফুলজান বিবি নামক জনৈক ভক্ত তার বাড়িতে প্রিয় মুর্শিদকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সেখানে যাবার সময় ঝড়-তুফানে বাঁশের সাঁকোটি ভেঙ্গে যায় এবং ভক্তের হাতের কুপি বাতি নিভে যায়। আমিরুল আউলিয়া শিষ্যের হাত ধরে বললেন চোখ বন্ধ করতে। ক্ষণিক পর চোখ খুললে ভক্ত দেখতে পান, তাঁরা অনায়াসে পার হয়ে এসেছেন। হযরত 'ফু' দিয়ে নিভে যাওয়া কুপি বাতিটিও জ্বালিয়ে দিলেন। এই কারামত দেখে ভক্ত বাবাজানকে তাদের ভিটে বাড়ীটি দান করে দেন যা বর্তমানে আমির ভাণ্ডার নামে পরিচিত।

হযরত কেবলায়ে আলম (ক.) একবার মাইজভাণ্ডার দরবারের এক অনুষ্ঠানে আসার সুবিধার্থে তাঁর প্রিয় কালা সোনার জন্য পালকী পাঠিয়েছিলেন। হামিদ গাঁওয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক লালমিয়া মাস্টার শাহ্ সাহেব কেবলাকে প্রশ্ন করলে উত্তরে জেনেছিলেন, 'আমার কাছে খারাপ মানুষ আসে। তাদেরকে আমি ভালো পথে আনার চেষ্টা করি।' আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা আবদুস সোবহান (রহ.) আমিরুল আউলিয়ার সংস্পর্শে ফয়েজ-ই-ইত্তেহাদী লাভ করেছিলেন। অথচ তখন হযরত আমিরুজ্জামান (ক.) জীবিত ছিলেন না।

কঠোর রিয়াজত ও কঠিন পরীক্ষা: আমিরুল আউলিয়া পীরের দরবারে গিয়েছিলেন একান্তই ভক্ত হয়ে। তিনি বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লেগে

গেলেন। তাঁর প্রতি দরবারের প্রত্যেকের স্নেহ-মমতা বেড়ে যায়। তিনি মাঝে মাঝে কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকতেন যে, খানাপিনার কথাও স্মরণ থাকতো না। আমিরুল আউলিয়ার অন্যতম কাজ ছিল সৈয়দ পরিবারের শিশুদের দেখা শোনা করা, হযরতের তামাক সাজিয়ে দেয়া এবং অন্দরমহলে ও বাইরে মেহমানদারী করা ইত্যাদি। হযরত কেবলার ওযুর পানি, গোসলের পানি যোগাড় করে রাখাও ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। কথিত আছে যে, মাঝে মধ্যে তাঁকে হযরত মা সাহেবানী গোপনে ভাত খাইয়ে দিতেন। তাঁর কষ্ট দেখে কখনোবা হযরত কেবলার সাথে মৃদু অভিমানও করতেন মা সাহেবানী। হযরত আমিরুজ্জামান কেবলাকে অন্দরমহলবাসীরা আপন পরিবারের সদস্যদের ন্যায় জানতেন। তাঁর বিনয়-ভক্তি রিয়াজতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হযরত কেবলায়ে আলম ‘কালা সোনা’ নামে অভিহিত করেছিলেন। কথিত আছে যে, একবার হযরত কেবলা বাথরুমে যাবার মনস্থ করলেন। আমিরুজ্জামান কেবলাও হাতে বদনা নিয়ে পিছনে পিছনে ছুটলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরতের চলার পথে দুর্গন্ধময় ময়লা পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি আদব সহকারে উক্ত ময়লা পথ থেকে সরিয়ে ফেলেন। এই রকম অনেক কঠোর রিয়াজত তিনি করেছেন যার কোন সংখ্যা-পরিসংখ্যান নেই। এই সম্পর্কে স্বয়ং আমিরুল আউলিয়া তাঁর কবিতায় বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

হীন আমিরুজ্জমা তুমি অলি হইলা কে নে।
এত কঠিন তোর পরীক্ষা কারণে।

নিজের প্রাণ অপেক্ষা মুর্শিদের হুকুমকে তিনি বেশী প্রাধান্য দিতেন। ছোটখাটো কতো যে পরীক্ষা তাঁর উপর হয়েছে তার সীমা-পরিসীমা নেই। তদুপরি নিম্নে বর্ণিত কঠিন ও অগ্নিপরীক্ষা সমূহও তিনি মুর্শিদের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সহজভাবে নিয়েছিলেন।

১. হযরত কেবলার হুজ্‌রা শরীফের সামনে একটি খেজুর গাছ ছিল। উক্ত খেজুর গাছের একপাশে তিনি বিষাক্ত খেজুর কাঁটার স্তূপ করে জানতে চাইলেন ভক্তরা তাঁকে কি ধরনের ভালবাসে। সবাই জবাব দিলেন “প্রাণের চেয়েও অধিক।” অতঃপর তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন গাছের উপর উঠে কাঁটার স্তূপে লাফ দিতে। এ কাজ করার সাহসই কারো ছিল না বিধায় সবাই মাথা নিচু করে রাখলেন। পরে তিনি ডাকলেন প্রিয় কালাসোনাকে, “তুমি লাফ দিতে পারবে?” এ ধরনের প্রশ্নে আমির ধন প্রায়ই একটি জবাব দিতেন, “মুর্শিদের হুকুম হলে অবশ্যই পারি বা পারব”। এরপর হযরত কেবলা (ক.) ইঙ্গিত করা মাত্রই গাছের উপরিভাগে উঠে তিনি বিষাক্ত কাঁটার স্তূপে মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়েন। তাঁর মনে হল যেন কোন নরম গদীর উপর বসে আছেন। হযরত কেবলায়ে আলম পাশে গিয়ে দেখেন যে, কালাসোনার কাপড়ের এক কোণায় ছোট একটি খেজুর কাটা লেগে আছে। তা দেখে তিনি জজবা হালতে বললেন, “আমার সাথে বেয়াদবি! দূর হও”। ঐদিন থেকেই মাইজভাণ্ডার এলাকায় খেজুর গাছের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

২. হযরত কেবলায়ে আলম একবার দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার ডান হাতে বেহেশ্ত, বাম হাতে দোযখ, কে কোনটা নেবে নাও'। অমনি বেহেস্তের উদ্দেশ্যে সবাই ডান হাত আঁকড়ে ধরলো যে কারণে হযরত কেবলা একদিকে ঝুঁকে পড়েন। সামান্য দূরে প্রিয় কালাসোনা নত শিরে দণ্ডায়মান। তাঁর উদ্দেশ্যে হযরত কেবলা বললেন, "তুমি নেবে না"? হুকুম পেয়ে তিনি দৌড়ে এসে বাম হাত নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন। হযরত কেবলা তাঁকে বললেন, "সবাই বেহেশ্ত নিল আর তুমি দোযখ নিলে কেন"? আদরের কালাসোনা জবাব দিলেন, "বেহেশ্ত-দোযখ বুঝিনা, মুর্শিদ কেবলার হাত খালি থাকবে কেন, এই হাত যেখানে থাকে আমি সেখানেই থাকব"। এরপর ভক্তদের উদ্দেশ্যে হযরত কেবলা বললেন, "তোমরা বেহেশ্ত চেয়েছ, বেহেশ্তই পাবে, আমার কালাসোনা নিয়েছে দোযখ! সে চেয়েছে আমাকে। সুতরাং, আমি তাঁর সঙ্গেই আছি।"

৩. অন্য একদিন হযরত কেবলা হাতে তলোয়ার নিয়ে জজ্বা হালতে ঘোষণা দিলেন, "যাকে পাই মাথা কেটে নেব।" এই কথাতে ধারে-কাছে যারা ছিল সবাই দ্রুত সরে দাঁড়াল। আমিরুল আউলিয়া খেয়াল করলেন "ইব্রাহিম (আ.) নিজ পুত্রকে কোরবানের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছেন জবাই করতে, আমি যদি ইসমাইল হয়ে পিতাজির ইচ্ছা পূরণ করতে না পারি, তাহলে কিসের জীবন? জীবনের মূল্যই বা কি? এই কথা ভাবার পরপরই তিনি মুর্শিদের তলোয়ারের সম্মুখে মাথা নত করে বললেন, "হে মুর্শিদ কেবলা! দয়া করে গোলামকে কোরবানী দিন।" অমনি হযরত কেবলায়ে আলম তলোয়ার ফেলে দিলেন এবং অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের মুর্শিদ কি খন্ডিত ছের (মাথা) জোড়া লাগাতে পারেন না?"

৪. একদিন দরবারের মাঠে বড় ডেক্চি (তবার্রুক রান্নার ডেক্চি) আনালেন হযরত কেবলা (ক.)। তারপর কয়েকজন ভক্তকে বললেন চুলা তৈরী করে আগুন জ্বালাতে। এরপর ডেক্চিতে পানি রেখে চুলায় আগুন জ্বালানো হল। ভক্তরা কেউ তখনও কিছু বুঝতে পারছে না। কোন উরস নেই, অথচ ডেক্চিতে পানি ফুটছে তখন। একসময় ডেক্চির পানি এতই উত্তপ্ত হল যে, আস্ত একটা গরু সেখানে ফেলে দিলে হাড্ডি থেকে মাংস ঝরে পড়বে। এমতাবস্থায় হঠাৎ কোথা থেকে ডেক্চির সামনে কালা সোনা গিয়ে দাঁড়ালেন। অমনি হযরত কেবলায়ে আলম কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, "একে ডেক্চির মধ্যে ফেলে দাও, সে বড়ই বিরক্ত করে।"

কালা সোনাকে ডেক্চির মধ্যে ফেলে দেয়া হল। সবাই ডেক্চির অদূরে গিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল আমিরুজ্জমা বোধ হয় এতক্ষণে মারা গেছেন। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন এবং আফসোস করতে লাগলেন। এক সময় হযরত কেবলা ডেক্চির কিনারে গিয়ে দেখলেন! তাঁর আদরের কালাসোনা হাত পা নেড়ে খেলছেন যেমন ছোট বাচ্চারা গামলার মধ্যে খেলে! আলহামদুলিল্লাহ্। তিনি সবাইকে ডাকলেন এবং দেখালেন গরম পানিতে কালাসোনা কেমন করছে। তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "বেটা মরে নাই-কৈ মাছের প্রাণ"! আমিরুল আউলিয়ার এই কৃতিত্ব হযরত কেবলার জীবন্ত কারামত। এই পরীক্ষার আয়োজক ছিলেন হযরত কেবলায়ে আলম (ক.) এবং দর্শক ছিলেন অন্যান্য ভক্তরা। আর

পরীক্ষার একমাত্র উপলক্ষই ছিলেন আমিরুল আউলিয়া, বাকী সব হযরত কেবলারই লীলা। তাইতো শাহ্ সাহেব কেবলা লিখে গেছেন–

ভালো মন্দ যত ইতি সংসারের কাম
গুপ্তে করহ্ তুমি ব্যাপ্তে অন্যের নাম।

সৈয়দ শাহ্ আমিরুজ্জামানের সাত পুত্র। তাঁরা হলেন, সৈয়দ মুহাম্মদ সোলাইমান শাহ্ আমিরী (ক.), সৈয়দ মুহাম্মদ অলি উল্লাহ্ শাহ্ আমিরী (ক.), সৈয়দ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান শাহ্ আমিরী (ক.), সৈয়দ মুহাম্মদ মাওলানা হাবিবুর রহমান শাহ্ আমিরী (ক.), সৈয়দ মুহাম্মদ ডা. মোজাহেরুল হক শাহ্ আমিরী (ক.), সৈয়দ মুহাম্মদ লোকমান হাকিম শাহ্ আমিরী (ক.) এবং সৈয়দ মুহাম্মদ মাওলানা হারুন রশিদ শাহ্ আমিরী (ক.)। জীবদ্দশায় আমিরুল আউলিয়া নিজের জন্য তাবুত তৈরী করে রেখেছিলেন। এতে উত্তর ও পূর্ব-পশ্চিমে কুরআন শরীফের আয়াত ও বিভিন্ন হাদিস লিখেছিলেন মৌলানা আবদুর রশীদ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে, ২০ বৈশাখ, ১২ জিলক্বদ বিষ্যুদবার সকাল ৮টার দিকে তিনি নিজ পুত্র ও কন্যাদের ডাকলেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় নসিহত শেষে উত্তর-দক্ষিণ দিক হয়ে শুয়ে পড়েন তিনি। শোয়ার পর একবার উঠে আবারও শুয়ে পড়েন। ৩য় বার তিনি কলেমা শরীফ পাঠ করতে করতে হাজার হাজার আশেকগণকে অশ্রু সাগরে ভাসিয়ে সকাল ৯টায় মওলার দিদারে চলে গেলেন (ইন্নলিল্লাহি---রাজিউন)। ছোট বিবি মোহ্তারমা লা'আলজান বিবির বর্ণনা মতে, এ সময় তাঁর চেহারা মোবারক থেকে নূরের ছটা বের হচ্ছিল। এক কন্যার মতে, পিতাজীর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল তিনি মিটিমিটি হাসছেন। পরদিন দরবার পাকের পূর্ব পার্শ্বের বিশালাকার ধানি জমিতে দুইবার নামাযে জানাযা শেষে জিকিরে জলির মাধ্যমে নির্ধারিত স্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। হযরত কেবলায়ে আলমের বিশিষ্ট খলিফা হাফেজ বজলুর রহমান হাফেজ নগরী (রহ.) ভক্তদের নিয়ে জানাযা পড়ার জন্য আসার পথে শাহ্ সাহেব কেবলাকে দেখে অবাক হয়ে যান। পরম শিষ্য জলিল শাহ্কে ওফাতের একমাস পর খেলাফত দান করে তিনি নিজের স্বরূপ প্রতিভাত করেছিলেন সবার মাঝে।

আমির ভাণ্ডার শরীফে বছরে ৩টি উরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। ১ মাঘ, ১ আশ্বিন আমিরুল আউলিয়ার সন্তানদের সম্মিলিত উরস এবং ২০ বৈশাখ আমিরুল আউলিয়ার বেসাল দিবস। তিনি বলতেন, মাইজভাণ্ডার আর আমির ভাণ্ডার আলাদা নয়। আল্লাহ্র অফুরন্ত নেয়ামত, বরকত এখানে জারি থাকবে। অলি-আল্লাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের সাধক কবি। তাঁর বাংলা কবিতাসমূহে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ লক্ষ্যণীয়। এছাড়া আরবী ও ফার্সীতে তিনি অনেক গজল রচনা করেছেন।

সৈয়দ ফরিদুল আবছার আমিরী: লেখক,
আমির ভাণ্ডার দরবার শরীফ, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

কুতুবে জমান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা (রহ.)

আলহাজ্ব শাহ্ সুফি সৈয়দ এ জেড এম শেহাব উদ্দিন খালেদ

চট্টগ্রামস্থ বোয়ালখালী থানার আহ্‌লা দরবার শরীফ বহু পূর্ব থেকেই ইসলামী সুফি দর্শনে বিশ্বাসী তরিকতপন্থী মুসলমানদের এক মহামিলনকেন্দ্র। ইসলাম ধর্মের মহৎ বাণী, শান্তি প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে হযরত শেখ মোহাম্মদ ঘোরী (রহ.) সুদূর বাগদাদ শরীফ থেকে তৎকালীন বাংলার গৌর রাজ্য হয়ে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বোয়ালখালীতে তশরীফ আনেন। তাঁর সাধনা এবং শান্তির বাণী প্রচারের ফলে এই অঞ্চলের মানুষ-জন ক্রমশঃ ইসলামের মহান দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক দর্শনে জ্ঞান লাভ করেন। ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য হযরত শেখ মোহাম্মদ ঘোরী (রহ.) ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান দরবার শরীফ প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর আমলেই এই মসজিদ সংলগ্ন স্থানে একটি দীঘি খনন করা হয়। ইসলাম ধর্মের শান্তির বাণী প্রচার ও সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন সৎ কর্মের জন্য তাঁর জাহেরী জীবদ্দশায় লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত শেখ মোহাম্মদ ঘোরী (রহ.) বেসালপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর মাজার শরীফ ক্রমে আধ্যাত্মিক সাধনার পবিত্র স্থান হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। কথিত আছে যে, শেখ মোহাম্মদ ঘোরী (রহ.) মদীনা মোনাওয়ারায় হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারক জিয়ারতকালে হুজুর পুরনুর (দ.)-এর কাছে আরজ করেন যেন তাঁর বংশের প্রতিটি প্রজন্মেই আউলিয়া-কিরামের জন্ম হয়।

শেখ মোহাম্মদ ঘোরী (রহ.)-এর বেসালপ্রাপ্তির পর তাঁর বংশধরের মধ্যে যথাক্রমে হযরত শেখ দানু মিয়া সাহেব, হযরত শেখ মনীর আহমদ সাহেব, হযরত শেখ আনিস মিয়া সাহেব এবং হযরত মৌলভী সফর আলী সাহেব খাদেম হিসেবে আহ্‌লা দরবার শরীফ কেন্দ্রে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চা বজায় রাখেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মৌলভী সফর আলী সাহেবের ঔরশে কুতুবে জমান জনাব মাওলানা কাজী আসাদ আলী (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব পুরুষদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে লালিত হবার কারণে শৈশবেই তাঁর মনে গভীর খোদাপ্রেম সৃষ্টি-জিজ্ঞাসা ও ধর্মানুরাগের উন্মেষ ঘটে। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি হিন্দুস্থান গমন করেন। শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে এলে তৎকালীন শিক্ষানুরাগী প্রায় ৪০০ লোকের একটি দল চট্টগ্রামের তৎকালীন বন্দর ফিরিঙ্গীবাজারে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সে সময় ঐ পথ ধরে গমনরত তাঁর ছেলেবেলার শিক্ষক বাবু হরিশ চন্দ্র বসাক কৌতুহলী হয়ে সংবর্ধনা দেখতে গেলে জনাব কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা (রহ.) তাঁকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সম্মান করতেই পুরাতন ছাত্রকে চিনে বাবু বসাক তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং

প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। দেশে ফিরে তিনি বাড়িতে কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ্সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রচুর পড়াশুনা করেন এবং নিষ্ঠার সাথে পরহেজগারী ও তাকওয়া অর্জনে ব্রতী হন। এ সময় নিজ এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের আগ্রহের কারণে বিভিন্ন মাহফিলে তিনি ওয়াজ করতেন। অত্যল্পকাল পরে জনাব কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা (রহ.) চট্টগ্রামের তৎকালীন রাঙ্গুনিয়ায় কাজীর (বিচারক) পদে নিয়োজিত হন। সত্যমত ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে একজন কাজী হিসেবে তিনি সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আশৈশব লালিত খোদাপ্রেম ও অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা দীর্ঘদিন তাঁকে একজন কাজী হিসেবে আটকে রাখতে পারেনি এবং জমিদারীর নিরাপদ জীবনও তাঁকে কখনও হাতছানি দেয়নি। এই সময় তিনি উপমহাদেশখ্যাত মাইজভাণ্ডার শরীফের গোড়াপত্তনকারী হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বায়াত লাভে ধন্য হন। হযরত কেবলা গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এমন একজন উচ্চ স্তরের অলি-ই কামিল ও মজ্জুবে সালেক ছিলেন যে তাঁর সুস্পর্শে এসে সকলেই মুক্তির পথ পেয়েছিলেন এবং যোগ্যতা অনুসারে কামালিয়াতের বিভিন্ন দরজায় স্থান লাভ করেছিলেন। কুতুবে জমান জনাব কাজী আসাদ আলী কেবলা (রহ.) জন্মগতভাবে অলি-ই কামিলদের বংশোদ্ভুত হওয়ায় তাঁর মনে গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার ভাব বিরাজমান ছিল। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার কারণে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের আধ্যাত্মিক স্কুলে তিনি দ্রুত একজন উপযুক্ত শিষ্য হিসেবে গড়ে উঠেন। হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর নির্দেশিত সবক একনিষ্ঠভাবে পালন এবং তাঁর পবিত্র সোহবতে থাকার কারণে তিনি অতি সহজেই তাঁর মুরশিদের পরম নজর লাভের সৌভাগ্য হাসিল করেন। রিয়াজতের সুকঠিন সোপানসমূহ পার হয়ে সিদ্ধি লাভের পর তিনি হযরত কেবলা (ক.)-এর অন্যতম 'খলিফা' হিসেবে পরিণত এবং 'জনাব' উপাধিতে বিভূষিত হন। রিয়াজতের এক পর্যায়ে মাইজভাণ্ডার শরীফের নয়নমণি গাউসুল আযম বিল বিরাসত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী ও জনাব কাজী আসাদ আলী (রহ.) সাহেব কেবলা একযোগে দক্ষিণ চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়ে দীর্ঘদিন আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন।

খেলাফত প্রাপ্তির পর জনাব কাজী আসাদ আলী কেবলা (রহ.) আহ্লা দরবার শরীফে অধিষ্ঠান নিয়ে সুফিতত্ত্বের চর্চা ও সুন্নি মতাদর্শ প্রচারে নিয়োজিত হন এবং হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে দীক্ষা দান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইসলামের হুকুম আহ্কাম পালনে আন্তরিকভাবে যত্নবান ছিলেন। পাঞ্জেগানা নামায, রোজা পালন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত, ঈদের জামাতের ইমামতি ছাড়াও তাঁর জীবন-যাপন সম্পূর্ণরূপে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পালিত হত। নিয়মিত মোরাকাবা মোশাহিদার মাধ্যমে মগ্নতায় আচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া প্রায়শঃই তাঁকে আহ্লা দরবার শরীফের অদূরে পাহাড়-জঙ্গলে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হতে দেখা যেত। আশ্চর্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে তিনি চট্টগ্রামস্থ বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত খিতাব চরের হাসান শাহ্ ইউনানী (রহ.) এবং ইউসুফ শাহ্ ইউনানী (রহ.), বেঙ্গুরার পীরের দরগা,

করলডাঙ্গাস্থ কলন্দর শাহ্, উত্তর বোয়ালখালীর হাওলায় মামা-ভাগিনা এবং বোয়ালখালীর কালাইয়ারহাট সংলগ্ন মহিউদ্দীন শাহ্'র (রহ.) মাজার শরীফসমূহ সনাক্ত করার পর হযরত মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা সাহেব (রহ.) তাঁর "দেওয়ানে আজিজ" গ্রন্থে জনাব কাজী সাহেব কেবলা (রহ.)কে "সাহেবে কৃশ্‌ফ ও কারামত" খেতাবে ভূষিত করেন এবং উক্ত গ্রন্থে জনাব কাজী সাহেব কেবলার শানে একটি উচ্চমানের শে'র (কবিতা) লেখেন।
কামালিয়াত লাভের পর জনাব কাজী আসাদ আলী কেবলা (রহ.) তাঁর জীবনে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে অসংখ্য কারামত দেখিয়েছিলেন। প্রতিনিয়ত তাঁর কাছে প্রচুর লোক সমাগম ঘটত। এ দেখে তাঁর সহধর্মিনীগণ অভিযোগ করেন, "এত লোকজন আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত! নিশ্চয়ই তারা আপনার কোন কারামত দেখে থাকবে। অথচ আমরা নিকটজনেরা তো কিছুই দেখলাম না।" জবাবে তিনি বিনয়ের সাথে নিজের সাধারণত্বই প্রকাশ করেন। কিন্তু সহধর্মিনীগণ তাতে তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই পরীক্ষা করার জন্য একবার সারা রাত ধরে একযোগে তাঁরা পাহারা দিতে থাকেন এবং ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে পান। কিন্তু কোন কিছু দেখতে বা বুঝতে না পেরে সহধর্মিনীগণ হতাশাগ্রস্ত হন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, "গত রাতে বাবাজান কেবলা আমাদের এলাকায় তশরীফ এনেছিলেন এবং খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে চলে আসেন। দয়া করে খাদ্যের বাকী এই অংশটুকু তাঁর কাছে পেশ করবেন।" তার এই কথা স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই বিশ্বাস করলেন না। তখনই আরেক ভক্ত এসে বলল, "গত রাতে বাবাজান কেবলা আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। খাবার সময়ে হঠাৎ জজ্‌বা হালতে তিনি খাওয়া ছেড়ে উঠেন এবং সবাইকে চড়-থাপ্পর মেরে চলে যান। তাঁর অভুক্ত খাদ্য আমি নিয়ে এসেছি। দয়া করে তাঁকে এগুলো দেবেন।" একথা শোনার পর স্ত্রীগণ বিস্মিত হবার আগেই অন্য আরেক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললো, "মা জানেরা, গত রাতে বাবাজান কেবলা আমাদের এলাকায় উপস্থিত হয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে ছুটাছুটি করেছেন এবং কাছে ধারে গমনকারী সবাইকে চড়-থাপ্পর মেরে হঠাৎ করে একটি জুতো মোবারক রেখে চলে এসেছেন। আমি তা ফেরৎ দিতে এলাম।" এ কথা বলেই লোকটি এক পাটি কর্দমাক্ত জুতো মেঝেতে রাখল। সতর্কতার সাথে সারা রাত পাহারা দেয়া জলজ্যান্ত মানুষটার সম্পর্কে এতগুলো অসম্ভব ঘটনার কথা শুনে হতবিহ্বল স্ত্রীগণ কর্দমাক্ত জুতোটি নিয়ে কাজী সাহেব কেবলা এর শয়নকক্ষে গিয়ে অতীব বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, গত রাতে রাখা জুতো জোড়ার কেবল একটিই সেখানে আছে।
আহ্‌লা দরবার শরীফের সম্মুখস্থ দীঘিটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জ্বীন-পরীর তাণ্ডবকেন্দ্র এবং লোকজনের ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। এলাকার সাধারণ জনগণ জনাব কাজী আসাদ আলী কেবলা (রহ.)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, "বাবাজান, দেও-দানব আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করে। এ দীঘি তাদের আড্ডাখানা। আপনি দয়া করে একটু করম-নজর করুন।" জনাব কাজী আসাদ আলী সাহেব কেবলা (রহ.) অতঃপর জজ্‌বার হালতে সাত দিন সাত রাত পর্যন্ত এ দীঘিতে ডুব দিয়ে থাকার পর থেকে দীঘিটি জ্বীন পরীর প্রভাবমুক্ত এবং

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়। অতঃপর তিনি দীঘিতে কিছু চিনি ঢেলে দেন এবং বলেন, "যে কেউ যে কোন নিয়্যতে এই দীঘির পানি পান করলে মক্‌সুদ পূরণ হবে।"
সুন্নী মতাদর্শ প্রচার ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানের এক পর্যায়ে **১**লা শাবান **১৩১৫** হিজরী মোতাবেক **১৯১৫** ইং তারিখে আশেকদের শোক সাগরে ভাসিয়ে কুতুবে জমান জনাব কাজী আসাদ আলী কেবলা (রহ.)-এর বেসাল হয়।

আলহাজ্ব শাহ্ সুফি সৈয়দ এ জেড এম শেহাব উদ্দিন খালেদঃ লেখক,
আহ্লা দরবার শরীফ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.)

সৈয়দ নুর আহমদ বাবর

সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার দরবারে অসংখ্য সেজদা, সৈয়্যদুল খাতীমুন নবীউন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ)'র প্রতি লাখো দরূদ ও সালাম।

মহান আল্লাহ্ সকল প্রশংসার দাবীদার। তিনি অসীম করুণা ও কুদরতে মানব সৃষ্টি করেছেন এবং মানবকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর এই মানবকে হেদায়েত ও আল্লাহ্র পথে পরিচালনার জন্য তিনি যুগে যুগে নবী রাসূল বা মহামানব প্রেরণ করেছেন। এই সকল মহামানবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)। বিশ্ব মানবতার অগ্রনায়ক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর দুনিয়াতে সর্বশেষ নবী হিসাবেই আগমন এবং তাঁর বিদায়ের পর আর কোন নবী বা রাসূল দুনিয়ায় আসবেন না। কিন্তু রাসূলে করিম (দ.)-এর পর মানবকে সঠিক তৌহিদের আলোকময় পথে পরিচালনার জন্য অলি-ই কামিল নিযুক্ত থাকবেন।

মাওলানা রুমী মছনবীতে বলেন: প্রত্যেক দাওরা বা বৃত্তে জগতের আবর্তনের যুগে একজন অলি-ই কামিল বিদ্যমান থাকবেন যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। আধ্যাত্মিক সুফি সাধক অলি-ই কামিল মাওলানা শাহ্ অলি উল্লা কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার রাজাপুর গ্রামে ৯ ফাল্গুন, বুধবার ১২২৭ বাংলা জন্মগ্রহণ করেন। রাজাপুর গ্রামের নামানুসারে এই মহান অলি "রাজাপুরী" নামে অভিহিত হন। আরবী শিক্ষায় জামাতে উলা শেষ করার পর বিভিন্ন মসজিদে খোদায়ী ফজিলতের জন্য কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থেকে নিজেকে উৎসর্গিত করেন।

খোদায়ী সাধনার ধারাবাহিকতায় হযরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লা রাজাপুরী নোয়াখালী জেলার মুছাপুর গ্রামের লাল চান্দের বাড়িতে থেকে নিকটস্থ মসজিদে ইমামতি করতেন এবং একটি মক্তবে ছাত্রদেরকে আরবী শিক্ষায় দীক্ষিত করতেন। ইতোমধ্যে হযরত মাওলানা হাফেজ আহাম্মদ জৈনপুরী (রহ.) অত্র এলাকায় সফররত ছিলেন। রাজাপুরী হাফেজ আহাম্মদ জৈনপুরী (রহ.)-এর শিষ্যত্ব আরজ করেন। জৈনপুরী (রহ.) হুজুর দুই হাতের তালুবন্দ করে চোখ বুঝে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হঠাৎ রাজাপুরীকে বললেন, আপনার খেলাফত ও বায়াত আমার কাছে নেই। আপনি চট্টগ্রাম জেলার ইছাপুর (বর্তমান মাইজভাণ্ডার শরীফ) গ্রামের হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর নিকট চলে যান। সেখানে তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। জৈনপুরী (রহ.)-এর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়ে কিভাবে ইছাপুর হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে নিজেকে উৎসর্গ করবেন এই চিন্তায় রাজাপুরী ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ব্যাকুল ও অস্থির চিত্তে রাজাপুরী ঐ রাতে যখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন, তখন তিনি স্বপ্নযোগে ইছাপুর গ্রামের হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর

দরবার শরীফের পথ অবগত হন। পরদিন তিনি ইছাপুরের (বর্তমান মাইজভাণ্ডার শরীফ) উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

চট্টগ্রাম জেলার বারৈয়াঢালা পৌঁছার পর সন্ধ্যা হয়ে যায়। দুর্গম পাহাড়ী পথ ও চারিদিকে বনজঙ্গল দেখে তিনি হতাশ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আকস্মিক সম্মুখে একটি প্রদীপ দেখতে পান। রাজাপুরী দ্রুত হেঁটে গিয়ে দেখলেন, একজন লোক প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজাপুরীকে দেখামাত্র লোকটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় জিজ্ঞেস করেন, অ-বা তুঁই কডে যাইবা।

উত্তরে তিনি বললেন, আঁই ইছাপুর হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে যাইয়্যুম।

তখন লোকটি বললেন, কোন চিন্তা নগইজ্জ। আঁইও এডে যাইয়্যুম।

অতঃপর লোকটির সাথে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর অদূরে একটি দু'চালা ছনের ঘরে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দেখিয়ে দিয়ে লোকটি বললেন, ঐ ঘর হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর হুজরা শরীফ। রাজাপুরী নিকটস্থ পুকুর থেকে অজু করতঃ ফিরে এসে দেখেন লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এতে তিনি অবাক হন। তারপর দু'চালা ছনের ঘরে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর হুজরা শরীফে প্রবেশ মাত্রই গদী শরীফের ব্যক্তিকে দেখে তিনি বিচলিত হয়ে যান। কেননা সমগ্র পথে প্রদীপ হাতে যিনি পথ দেখিয়েছিলেন তিনিই গদী শরীফে শায়িত আছেন। এমতাবস্থায় রাজাপুরী হযরত কেবলার চরণযুগল জড়িয়ে ধরতেই হযরত কেবলা জিজ্ঞেস করলেন, অ-বা তুঁর নাম কি? রাজাপুরী স্বীয় নাম 'লাল মিয়া' বললেন। তখনই হযরত কেবলা লাল মিয়া নাম পরিবর্তন করে শাহ্ অলিউল্লা উপাধি প্রদান করেন এবং রাজাপুরীর পূর্ব পুরুষ হযরত আবু বকরের (রা.) বংশধর ছিলেন বলে জানান এবং সাথে সাথে রাজাপুরীকে বিদায় দেন। দরবার শরীফ থেকে বিদায় পেয়ে তিনি একটু অগ্রসর হয়ে দেখতে পান, মধ্যে যে সাঁকো আছে সে সাঁকোর পথের মাঝখানে হযরত কেবলা বসে আছেন। এই অবস্থায় তিনি স্বীয় মুর্শিদের আদব রক্ষার্থে পানি সাঁতরিয়ে খাল পার হন আর ঠিক সে মুহূর্তে হযরত কেবলা ওপার থেকে রাজাপুরীর হাত ধরে পুনঃ দরবার শরীফ নিয়ে আসেন এবং মাটির একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে ছয় মাস আটকে রেখে জাহেরী-বাতেনী শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা ফয়েজে ইত্তেহাদী ও ইলমে লদুনি শিক্ষার সূচনা করেন। দীর্ঘকাল অলিকুল শিরোমণি গাউসুল আযম মাওলানা সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ হযরত কেবলার খেদমত, সোহবত এবং খেলাফত হাসিল পরবর্তীতে গাউসুল আযম বিলবিরাসত বাবা ভাণ্ডারীর কাছেও আসা-যাওয়া করতেন। তিনি উভয়ের কাছ থেকে ফয়েজ ও খেলাফত লাভ করে "খলিফায়ে আজম" উপাধিতে ভূষিত হন।

এই মহান আধ্যাত্মিক সাধক অলি-ই কামিল রাজাপুর দরবার শরীফ এর মূল স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের আসাম, কুচবিহার ও কলকাতায় তাঁর অনেক ভক্তবৃন্দ রয়েছেন। মানবের কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার

মূলমন্ত্র তথা ইলমে মারফত বিতরণ করে তাওহীদের আদর্শ ও সত্য ধর্ম হতে বিপথগামী পথভ্রান্ত মানবকে দিয়েছেন সঠিক পথের সন্ধান। তাঁর আত্মিক সাধনার শিকড় এত গভীরে যে তিনি সমস্ত গুপ্ত-ব্যক্ত খোদায়ী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

হযরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ রাজাপুরী (রহ.) খোদার প্রেম-প্রেরণায় বিভোর হয়ে খোদার একত্বে মিশে বাকাবিল্লাহ্ স্তরে উপনীত হওয়ার পরও তিনি নিজেকে প্রচারের আড়ালে রাখতে পছন্দ করতেন। তাই তাঁর সম্পর্কে বিশদ কিছু লেখা সত্যিই দুঃসাধ্য কাজ। এখানে মাত্র দুটি বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, প্রথমতঃ রাজাপুর দরবার শরীফের পার্শ্বে বর্তমান খিলা রেলস্টেশন প্রতিষ্ঠালগ্নে এই মহান অলি হযরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.)-এর সম্মানার্থে "ফকির বাড়ি" রেল স্টেশন নাম করণ করা হয়। পরবর্তীতে কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে "ফকির বাড়ি" রেল স্টেশনটির নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হলে রাজাপুরী (রহ.)-এর ইতিবাচক ইশারায় খিলা স্টেশন নামে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৭১ ইংরেজী সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সকল ধর্মের অগণিত মানুষ পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাজাপুর দরবার শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহান সৃষ্টিকর্তার রহমতে হযরত মওলানা শাহ্ অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.)-এর ওয়াসীলায় প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে খিলা বাজারে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও আশ্রিত মানুষ পাক হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায়। হযরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.) স্বীয় মুর্শিদের স্মরণে তাঁর 'রহমানের নুর' গজলের বইতে লিখেছেন–

হযরত শাহা আহম্মদ উল্লাহ্, বুজুর্গ প্রধান
পূর্ব বাংলার মাইজভাণ্ডারে বসতের স্থান ॥
পরকালে গমন করলেন, ভবের দুয়ার ছেড়ে গেলেন
রীতিমতো বৎসর বৎসর, ওরশ আলীশান ॥
মাঘ মাসের দশ তারিখে, লোক যায় লাখে লাখে
দশ তারিখে উরস শরিফ, মোশ্রাফের দিন ॥
বিরাট জমাত ভারি, লোক যায় সংসার ছাড়ি
থর থর করে কাঁপে মাটি, ওরশের দিন ॥
সারে আলম ফয়েজ পায়, সেই তারিখে ফয়েজ বিলায়
না-মহরম নাহি কেহ, ওরশের দিন ॥
মাওলানা ধনে ফয়েজ পৌঁছায় ফয়েজ পৌঁছায়
চোখ থাকিলে চিনবা ফয়েজ ওরশের দিন ॥

এই বিশ্ব পরিমণ্ডলে খোদার ফজিলতের মাধ্যমে তিনি মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর ১৫৩ বৎসর বয়সে বিশ্বনিয়ন্তা দয়াময় আল্লাহ্তায়ালার সাথে মহা মিলনের জন্য চলে যান ১৩৮০ বাংলা, ১৮ ভাদ্র, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে।

হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি অলিউল্লা রাজাপুরী (রহ.) ছিলেন রাজাপুর দরবার শরীফের মূল ভিত্তি স্থাপনকারী। কিন্তু এই দরবার শরীফ যার হেফাজতে সু-প্রতিষ্ঠিত; বিকশিত ও সম্প্রসারিত হয়, তিনি হলেন রাজাপুরীর (রহ.) সেজ পুত্র পীরজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ রবিয়ল হোসেন (রহ.)। তিনি ১৩২৭ বাংলা ১২ রবিউল আউয়াল ২ আষাঢ় শুক্রবার রাজাপুর দরবার শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞান সঞ্চয়ের প্রথম থেকেই মহান পিতা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি অলিউল্লা রাজাপুরীর (রহ.) কদম শরীফে নিজেকে স্থান দেন এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার হুকুম-নিয়মাবলী পালনে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে থাকেন।

তিনি নিজের জীবনের সকল সাধনা দিয়ে মানবের কল্যাণ ও আত্মার মুক্তির জন্য প্রচার করেছেন আল-কুরআনের মর্মবাণী। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য তিনি বেছে নেন কঠিন সাধনার পথ। আধ্যাত্মিক জগতের পরিমণ্ডলে তিনি একজন সুফি সাধক যার বিচরণ রূহানী জগতের উচ্চ শিখরে এবং মানবকে ইশ্‌কে ইলাহীর পথ দেখানোর জন্য তাঁর জীবন নিবেদিত ছিল। এই বিশ্ব পরিমণ্ডল থেকে পীরজাদা শাহ্ সুফি সৈয়দ রবিয়ল হোসেন (রহ.) ১৩৯১ বাংলা, ১৭ আষাঢ় সোমবার, ২ জুলাই ১৯৮৪ খ্রি. আপন মাশুকের চিরবাঞ্ছিত গন্তব্যস্থলে ফিরে যান। বর্তমানে তাঁর আওলাদগণ দরবার শরীফের খেদমতে নিবেদিত আছেন। তন্মধ্যে সৈয়দ কবির আহমেদ রহমত মন্‌জিলের হেফাজত ও খেদমতে অনবদ্য ভূমিকা রাখছেন।

সৈয়দ নুর আহমদ বাবর : লেখক,
রাজাপুর দরবার শরীফ, লাকসাম।

মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল গণি চৌধুরী মাইজভাণ্ডারী (রহ.)

অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল গণি চৌধুরী

মাদারজাত অলি মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল গণি চৌধুরী মাইজভাণ্ডারী (ক.) বাল্যকাল থেকে মাইজভাণ্ডার শরীফে হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। একদা হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলা কাবা (ক.) গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দরবারে গেলে তিনি হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলা কাবা (ক.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "ওহে চৌধুরীর ছেলে চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের মহিষের দই খেতে আমার খুব ইচ্ছে করছে, আপনি কি আমার জন্য কাঞ্চনপুরের মহিষের দই আনতে পারবেন?" তদুত্তরে হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলা কাবা (ক.) বিনীতভাবে সম্মতি প্রদান করেন। সেদিন তিনি কাঞ্চনপুরে নিজ বাড়িতে চলে যান। পরের দিন খুব ভোরে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জন্য মহিষের দু'খানি বড় দই নিয়ে কাঞ্চনপুর থেকে নয় মাইল হেঁটে মাইজভাণ্ডার শরীফ আসেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা ভক্তের কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হন। এভাবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলার খেদমত গ্রহণ করতেন এবং তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করতেন। হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলা স্বীয় মুর্শিদের অর্পিত দায়িত্বগুলো সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন।

তিনি নিম্নের গানটি প্রায়ই গাইতে গাইতে মাইজভাণ্ডার শরীফের দিকে রওয়ানা হতেন–

নেকী আমি, বদি আমি, ভাল আমি, বুরা আমি।
ফানা আর বাকা আমি, আমি যে আমি, আমি না-আমি ॥
দিন কিবা রাত্রি আমি, নর কিবা নারী আমি।
স্বর্গ কি নরক আমি, আমি যে আমি আমি না আমি।
আলেম আমি, জাহেল আমি, আরেফ আমি, কামিল আমি।
প্রেম আমি, প্রেমিক আমি, আমি যে আমি, আমি না-আমি।
পিতা আমি-মাতা আমি, মাতার কোলে ছেলে আমি।
ছেলের হাতে খেলা আমি, আমি যে আমি, আমি না-আমি ॥
মকবুল অধিন আমি, মাওলাজী স্বাধীন আমি।
দিলেতে একীন আমি, আমি যে আমি-আমি না, আমি ॥
(৩৩ নং গান, গোলসনে ওসসাক)

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা যখন ওফাতপ্রাপ্ত হন, তখন হযরত চৌধুরী সাহেব (ক.) কেবলা কাবা রেংগুন ছিলেন।

রেংগুন থেকে এসে তিনি তাঁর মুর্শিদ কেবলার সদ্য নির্মিত মূল রওজা শরীফে আর্ত-আকুতি করতে লাগলেন। তখন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা ইল্‌হামের মাধ্যমে হযরত চৌধুরী সাহেব (ক.) কেবলা কাবার হাতে একটি প্রজ্জ্বলিত বাতি দিয়ে বলেন, “তুমি দমদমাতে এসে বসতি স্থাপন কর।” স্বীয় মুর্শিদের নির্দেশে এবং হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার আহ্বানে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে হযরত চৌধুরী সাহেব কেবলা কাবা (ক.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বস্থ ঐতিহাসিক দমদমা গ্রামের বর্তমান ‘গাউসিয়া রহমানিয়া গণি মঞ্জিল’-এ হিজরত করে বসতি স্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা প্রায় সময় দমদমা সফরে আসতেন এবং এখানে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতেন। পরবর্তী সময়ে হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবাও ঐতিহাসিক দমদমা শরীফে গভীর রাতে সফরে আসতেন এবং মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল গণি চৌধুরী মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার সাথে রহস্যপূর্ণ কালাম বিনিময় করতেন। হযরত চৌধুরী সাহেব (ক.) কেবলা কাবা প্রণীত প্রায় ৩৮০ পৃষ্ঠার আধ্যাত্মিক পাণ্ডুলিপিতে খোদায়ী রহস্য বিধৃত হয়েছে।

প্রখ্যাত মাইজভাণ্ডারী গবেষক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর কৃত মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর সাথে হযরত শাহ্ আব্দুল গণি চৌধুরীর অনেক রহস্যপূর্ণ আচরণ ও বাক্যালাপ চলতো। এর আলোকে তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যাবৃত সাঙ্কেতিক লেখার যে পাণ্ডুলিপি, তা আজও গবেষকদের বিস্ময় উদ্রেক করে। উক্ত গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় ফুটনোটে আছে–এই সাঙ্কেতিক লেখার ভিডিও এবং আলোকচিত্র সংগ্রহ করে ফিনল্যান্ডে হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. লাউরি হারবিলাহত্তি হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত (জুলাই ’৯৭) আন্তর্জাতিক ফোকলোর সম্মেলনে তা উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক সুফিতাত্ত্বিক গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জার্মানীর মার্টিন লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. হান্‌স হার্ডার পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পর্কে গত ১১-০৩-২০০১ ইং লিখিত যে মন্তব্য করেন, তা নিম্নরূপ –

I have not seen the original manuscripts of Hazrat Abdul Ghani Chowdhuri; but it seems to me that an effort for their publication is very much in order--even if many of us don't understand them. We do understand that there is something to be understood here. I suggest that the manuscripts be first scanned and added to the Maizbhanderi web site. In a second step, money should be raised for a well-done offprint publication which would be a benefit both for Maizbhandaris and scholars of Sufism etc. from Bangladesh and abroad.

এছাড়া জাপানের বিখ্যাত 'টোকাই' বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য গবেষক, শিক্ষক এবং জাপান সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ সায়েন্স-টোকিও এর রিসার্চ ফেলো ড. মাশাহিকো তোগাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলো দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং কয়েকটি পাণ্ডুলিপির আলোক চিত্র ধারণ করে গবেষণার জন্য নিয়ে যান। এ সমস্ত পাণ্ডুলিপির সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হলে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার নতুন গিদন্ত উন্মোচিত হবে। তাই মাইজভাণ্ডারী গবেষক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাধকগণকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

অধ্যাপক সৈয়দ সফিউল গণি চৌধুরী : বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক;
সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া রহমানিয়া গণি মঞ্জিল,
দমদমা, মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা
সৈয়দ মুহম্মদ রজব আলী আল্ শাকরাপুরী (রহ.)

পীরজাদা সৈয়দ মেসবাহ উদ্দীন আহমদ

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলাধীন শাকরা গ্রামের বুজুর্গ শাহ্ সুফি অলি আহমদ মিয়াজীর পুত্র সৈয়দ মুহম্মদ রজব আলী আল শাকরাপুরী (রহ.)। শৈশব থেকেই ভাবুক প্রকৃতির এই সাধকের ধর্মীয় শিক্ষায় হাতেখড়ি হয় পিতার কাছে। সম বয়সীদের সাথে খেলাধূলায় মত্ত না থেকে তখন থেকেই সব সময় নামায, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের কারণে তিনি সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। কুমিল্লা শহরে নবাব হোচ্ছাম হায়দর প্রতিষ্ঠিত হোচ্ছামিয়া মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে তাঁর মেধা ছাত্র-শিক্ষকদের নজর কাড়ে। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতার আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি জমাতে উলা পাশ করেন।

সৈয়দ মুহম্মদ রজব আলী আল শাকরাপুরী (রহ.) তাঁর অর্জিত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে চলে আসেন নিজ গ্রামে। এলাকাবাসীকে অজ্ঞতা ও ধর্মহীনতা থেকে মুক্ত করতে তিনি ধর্মপ্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান শুরু করেন। এ সময় তাঁর মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলে পিতা তাঁকে বিবাহ করিয়ে দেন। তারপরও সংসারে যেন মনস্থির হয়না। তৎকালীন কুমিল্লা শহরের প্রখ্যাত কুতুবুল আউলিয়া হাফেজ ক্বারী হযরত শাহ্ সুফি আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী (রহ.)-এর নিকট বহু লোকের ফয়েজপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে তিনি সেখানে ছুটে যান এবং মুরিদ হবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু শাহ্ সুফি আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী এই বুজুর্গের আলোকিত জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন মাইজভাণ্ডারের গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সন্ধান করতে। অগত্যা অনেক খোঁজাখুঁজি ও পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে তিনি হাজির হন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে। এখানকার আধ্যাত্মিক সাধক গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে সানন্দে মুরিদ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধান দেন।

১৯০৬ সালের এক পবিত্র দিবসে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা কাবা জান্নাতবাসী হলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারীর খেদমতে নিয়োজিত থেকে তিনি কঠোর রিয়াজত শেষে বেলায়তপ্রাপ্ত হন। তারপর শুরু হয় একনিষ্ঠতার পরীক্ষা। কথিত আছে, একদিন বাবা ভাণ্ডারী তাঁর হুজরা শরীফে অবস্থানকালে জনৈক খাদেম পিতলের বদনা নিয়ে হাত মোবারকে পানি ঢালছিলেন। এসময় ভয়ে হুজরা শরীফে কেউ প্রবেশ না করলেও আল্লামা শাকরাপুরী নির্ভয়ে সেখানে ঢুকে বাবা ভাণ্ডারীকে তাজিমী সেজদাহ্ দিলেন। হঠাৎ বাবা ভাণ্ডারী হুংকার দিয়ে পিতলের বদনা হাতে নিয়ে আল্লামা শাকরাপুরীর মাথায় আঘাত করেন। এই ঘটনায় চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলে বাবা ভাণ্ডারী আবারো নিজ হাতে মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে পট্টি

বেঁধে দিতে বলেন। মাসাধিককাল সেখানে থেকে আল্লামা শাকরাপুরী সুস্থ হয়ে উঠলে বাবা ভাণ্ডারীর নির্দেশে তিনি পুনরায় বাড়ী ফিরে আসেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খেলাফত লাভের পর তাঁর বাড়ীতে দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসত। এলাকাবাসী তাঁকে বুজুর্গ কামিল অলি-আল্লাহ্ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ সময় তিনি স্থানীয় মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায, জুমার নামায ও দুই ঈদের নামাযে ইমামতি করা শুরু করেন। এলাকাবাসীর অনুরোধে স্থানীয় পঞ্চায়েত বোর্ডে ১০ বৎসর ধরে বোর্ড প্রধান হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

বাবা ভাণ্ডারীর 'দস্ত এ শাফা' প্রাপ্ত আল্লামা শাকরাপুরীর বেলায়তি ও কামালিয়তের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় প্রতিদিন অসংখ্য রোগী এসে তাঁর কাছে সাহায্য চাইত। তিনি তাদের বিস্কুট, বাতাসা ইত্যাদি খাইয়ে সুস্থ করে তুলতেন। এ ঘটনায় হিংসার বশবর্তী হয়ে একদিন জনৈক ব্যক্তি বিষমিশ্রিত একটি বাতাসার প্যাকেট তাঁকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য্যজনকভাবে এই আধ্যাত্মিক সাধক সেদিন বাতাসার প্যাকেটটি রোগীদের মাঝে বিতরণ না করে খাদেমের সাহায্যে মাটির পাতিলে রেখে দেন এবং তাতে পানি ঢেলে দেখেন যে, পানির রং কালো হয়ে গেছে। পরে তিনি সেই পাতিলটি মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন।

শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহম্মদ রজব আলী আল শাকরাপুরী (রহ.) সাহেবে কশ্ফ ছিলেন। তিনি অসংখ্য কারামত প্রদর্শন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং ভক্তদের নামায, রোজা, জিকির-আজকার পালনে কঠোর নির্দেশ দিতেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচার ও বিকাশের প্রথমদিকে তিনি ব্যাপক বাধা-বিপত্তি ও বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও থেমে থাকেননি। সব সময় লোকারণ্য থাকত তাঁর দরবার শরীফ। একবার লাকসাম অঞ্চলে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে এলাকাবাসী আল্লামা শাকরাপুরীকে বৃষ্টির জন্য দোয়া চাইতে অনুরোধ জানান। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অনুরোধ রক্ষার্থে ভক্ত মুরিদান ও এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে উন্মুক্ত এক মাঠে সকাল ১০টায় নামায আদায় পূর্বক মোনাজাত শুরু করেন। এমন সময় হঠাৎ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া আকাশ থেকে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টিপাত। মোনাজাতরত অবস্থায় ভিজতে লাগল মাঠের সকলে। প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি মোনাজাত শেষ করলেন।

আল্লামা শাকরাপুরী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা অনুসারে তাঁর দায়রা শরীফে ঢোল, বাদ্য ও গান-বাজনাসহ ভক্তদের নিয়ে জিকির করতেন। এ কারণে জাহেরী আলেম ও ওলামাগণ তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরই বাড়ীর পার্শ্বস্থ মাঠে বিচারের ব্যবস্থা করেন। এতে কুমিল্লা ও নোয়াখালীর বিখ্যাত আলেমদের দাওয়াত করা হয়। লাকসাম পশ্চিম-গাঁয়ের নবাব সৈয়দ গাজীউল হক চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করবেন বলে ঠিক করা হয়। যথাসময়ে আল্লামা শাকরাপুরীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে ওলামাগণ জনগণকে উত্তেজিত করে তুলেন। এদিকে নবাব চৌধুরী সভাস্থলে আসার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হলে তাঁর মাতা সৈয়দা বদরুন্নেছা চৌধুরী পথ আগলে রেখে গমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি খুলে বলেন। এতে মা তাঁকে বাধা দেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মাইজভাণ্ডারের তবার্‌রুক খেয়ে তিনি পুত্র সন্তান

লাভ করেছেন। শাকরার পীর সাহেব একজন বুজুর্গ অলি। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করাটা অন্যায় হবে। অবশেষে নবাব গাজীউল হক আর সভায় এলেন না। তাঁর আগমন স্থগিতের সংবাদ পেয়ে সভায় উপস্থিত লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং দলে দলে আল্লামা শাকরাপুরীকে এক নজর দেখার জন্য দায়রা শরীফে ভীড় জমায়।

একদিন চৌদ্দগ্রাম থানার কোমরাডোগা গ্রাম হতে মৃতপ্রায় ডা. আবদুল গণিকে তক্তার উপর বহন করে দুইজন ব্যক্তি দায়রা শরীফে হাজির হয়। আল্লামা শাকরাপুরী এ অবস্থা দেখে তাকে রেখে উক্ত দুই ব্যক্তিকে চলে যাবার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে দুই বৎসর যাবৎ লবণহীন কচুশাক ও খেসারী ডাল খাইয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনেন। পরবর্তীতে ডা. গণি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। এমনি আরেকটি ঘটনার প্রমাণ পেয়েছিলেন দাউদকান্দি থানার জুরানপুর নিবাসী কফিল উদ্দিন ভূঁঞা। চক্ষুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এই ব্যক্তি অনেক চিকিৎসার পরও আরোগ্য লাভ না করে অবশেষে অন্ধ হয়ে যান। আল্লামা শাকরাপুরীর সংস্পর্শে এসে ৪-৫ বৎসর পর তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে সক্ষম হন। এছাড়া লাকসাম থানার দরবেশপাড়া গ্রামের খুনের মামলার আসামী আলীম উদ্দিনকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা, কনকশ্রী গ্রামের সাপে কাটা মৃত মহিলার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা এবং খড়ম পায়ে দিয়ে পানির উপর হেঁটে যাওয়ার মতো অলৌকিক কেরামতি দেখিয়ে তিনি নিজ সাধন-জীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কুমিল্লার দৌলতপুর গ্রামের শাহ্ সুফি আলতাফ আলী ফকির, চান্দিনার কাশিমপুর গ্রামের শাহ্ সুফি দেওয়ান আবদুল গণি, কিশোরগঞ্জের ভৈরব গ্রামের শাহ্ সুফি চাঁদ মিয়া ফকির, লাকসামের রমাবল্লভপুর গ্রামের শাহ্ সুফি দেওয়ান আজগর আলী, কুমিল্লার অরণ্যপুরের শাহ্ সুফি আমজাদ খাঁ ফকির, চৌদ্দগ্রামস্থ জুপুয়া গ্রামের শাহ্ সুফি মওলানা আলী আহমদ, মাজার সুজানগরস্থ শাহ্ সুফি হাফিজ উদ্দিন মুনসী, ভাটপাড়ার শাহ্ সুফি আবদুল লতিফ, মতলবের তালতলী এলাকার শাহ্ সুফি বছির উদ্দিন সরকার এবং শাহ্ সুফি আরব আলী মুন্সী।

এই মহান আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর পীর মুরশিদ গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.)-এর দুই বছর পূর্বে **১৩৪১** বাংলা সনের **১৯** বৈশাখ ৬৪ বছর বয়সে জান্নাতবাসী হন (ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন)। এখনো তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায় বৃহত্তর কুমিল্লা তথা লাকসাম উপজেলার সর্বস্তরের জনতা।

পীরজাদা সৈয়দ মেসবাহ উদ্দীন আহমদ : লেখক,
শাকরাপুর দরবার শরীফ।

হযরত মাওলানা শাহ্ সোলতান সৈয়দ জমির উদ্দিন আহমদ নূর নগরী (ক.)

পীরজাদা এ কে এম রওশন মিঞা

লাখো সালাত ও সালাম মাহবুবে খোদা, মখলুকাতের মূল উৎস ও আদি জনাবে আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোজতবা (দ.)-এর উপর এবং তাঁরই আহলে বাইত, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁরই উত্তরসূরী আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি অসংখ্য সালাম প্রেরণ করি, যাদের নিগাহে করম ও কৃপাদৃষ্টিতে তাঁর জীবনের সার-সংক্ষেপ রচনা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

দ্বাদশ শতাব্দির বাংলাদেশের কথা বলছি। এই দেশেরই কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ক্ষুদ্র একটি গ্রাম লতিফ শিকদার নামে পরিচিত। এই ক্ষুদ্র গ্রামেই হযরত মাওলানা সৈয়দ জমির উদ্দিন আহমদ নূরনগরী (ক.) প্রকাশ তিশ্নাপুরীর জন্ম হয় ১২৮০ বাংলার ১৭ শ্রাবণ সোমবার। এই মহান আল্লাহ্র অলির পদস্পর্শে লতিফ শিকদার গ্রাম এখন 'নগর শরীফ' নামে আশেকানদের তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে।

হযরত নূর নগরী (ক.) বংশের দিক দিয়ে হযরত সৈয়দ সোলতান ইব্রাহীম শাহ্ বল্খি মাহরুহী (রহ.)-এর অষ্টম বংশধর। তিনি মধ্য এশিয়ার বল্খ রাজ্যের সোলতান ছিলেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এদেশে আসেন। তাঁর মাজার শরীফ বর্তমানে বগুড়ার মহাস্থান গড়ে বিদ্যমান আছে।

হযরত নূর নগরী (ক.) চট্টগ্রামের দারুল উলুম মাদ্রাসায় পাঠ্য জীবন শেষ করে কিছুদিন বাড়িতে অবস্থান করার পর কুমিল্লা শহরের অনতিদূরে কালিকাপুর কাজী বাড়িতে জায়গীর থেকে মসজিদে ইমামতি করতেন ও মসজিদের পাশে মক্তবে শিক্ষকতা করতেন। অবসর সময়ে কঠোর ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। শৈশবকালে অর্থাৎ নয় বছর বয়স থেকে তিনি পাঞ্জেগানা নামায, রোজা ও পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। চট্টগ্রামে মাদ্রাসায় পড়ার সময় যে ইবাদত বন্দেগী করেছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর এক সহপাঠি পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিবাসী মরহুম আব্বাস আলী সাহেব বলেন, আমি জীবনে অনেক বুজুর্গ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করেছি। কিন্তু হযরত নূর নগরীর (ক.) মত ইবাদতী, সংযমী, সহমর্মী ও কঠিন সাধনারত লোক কোথাও দেখিনি।

পাঠ্যাবস্থায় তাঁর ধর্মীয় চেতনা বিকশিত তথা আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ হয়। শরীয়তের বিধানগুলোসহ নফল ইবাদত-আরাধনা কঠোরভাবে অনুশীলন করতেন। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য সুপ্রসিদ্ধ পীর দরবেশ ও অলি-ই-কামিলগণের সন্ধান করে তাঁদের সাহচর্যে বা মাজারে হাজির হয়ে ঐশীতত্ত্ব জ্ঞানে নিমগ্ন থেকে ঐশী প্রেম অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। এ সময় তিনি কুমিল্লা দারোগা বাড়িতে অবস্থানরত প্রসিদ্ধ পীরে কামিল মাওলানা শেখ আবদুল্লাহ্ গাজীপুরী শাহ্ (রহ.) সাহেবের খেদমতে আসা-যাওয়া করতেন। তাছাড়া কখনো কখনো তাঁকে সিলেট হযরত শাহ্জালাল (রহ.) শাহ্র মাজারে ও খড়মপুরের হযরত

কল্লা শহীদের (রহ.) মাজারে রাত্রিকালে ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় দেখা যেত। কিছুকাল কালিকাপুর অবস্থানের পর তিনি কুমিল্লার অদূরে বুড়িচং উপজেলার রামনগর গ্রামে সরকার বাড়িতে জায়গীরে চলে আসেন। এখানেও তিনি মসজিদে ইমামতি ও মক্তবে পাঠ দান করতেন। এ সময় তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে আরবী শিক্ষক হিসাবেও যোগদান করেন। তখন থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন-সাধনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে। অনাহার, অর্ধাহার ও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এই সাধন-ভজনকালে প্রায়ই সায়েমুদ্দাহার বা সারা বৎসর রোজা পালন করতেন। রামনগর গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে এশা নামাযের পর রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। আখাউড়ার নিকটে খড়মপুর কল্লা শহীদের মাজারে অনেক রাত্রে তাঁর সাক্ষাত পাওয়া যেত। আবার প্রত্যুষে ফজর নামাযের সময় রামনগর মসজিদে ইমামতি করতেও দেখা যায় তাঁকে।

পীরের সন্ধানে তিনি বাহির হলেন। প্রায়শঃ কুমিল্লা দারোগা বাড়ীতে গাজীপুরী শাহ্ (রহ.) সাহেবের নিকট আসা-যাওয়া করতেন। তাঁরই আদেশে ঢাকার মশুরীখোলার শাহ্ আহছান উল্লা সাহেবের নিকট যান। কিছুকাল তাঁর সাহচর্য্যে থাকার পর কুমিল্লা ফিরে আসার পথে আজিমপুরের হযরত দায়েম শাহ্ (রহ.) এবং দিলকুশার হযরত নেয়ামত উল্লা (রহ.) এর সঙ্গেও দেখা করে আসেন। কুমিল্লা ফিরে এসে আবার গাজীপুরী (রহ.)-এর সঙ্গে দেখা করলে গাজীপুরীর নির্দেশে এই প্রথমবারের মতো মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের তৎকালীন পীরে কামিল গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। চট্টগ্রাম পৌঁছার পর রেল স্টেশন থেকে বের হতেই তাঁর সামনে এক পাগলবেশী লোক এসে তাঁকে সালাম দিয়ে জানালেন যে, তাঁর নাম নজির আহমদ। তিনিও মাইজভাণ্ডার শরীফে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, এই নজির শাহ্ (রহ.) তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের সুপরিচিত মজ্জুব ফকীর ও শহর কুতুবদের মধ্যে অন্যতম। চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের পাশেই তাঁর মাজার শরীফ বর্তমানে বিদ্যমান আছে। হযরত নজীর শাহ্ (রহ.) ও নূর নগরী (ক.) এক সাথে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে গিয়ে পৌঁছলেন। পথ প্রদর্শক হিসাবেই যেন নজির শাহ্ (রহ.)কে ভাণ্ডারী পাঠিয়েছেন।

গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা তখন নিজ হুজরাতে ভক্ত-আশেক পরিবেষ্টিত হয়ে গদীতে বসা ছিলেন। নজির শাহ্ (রহ.) নূর নগরীর (ক.) হাত ধরে হুজরাতে পৌঁছা মাত্র হযরত কেবলা জজ্‌বায়ী হালতে চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষায় কালাম ফরমালেন, "আঁর পোয়া নূরনগরী আইস্যে।" অর্থাৎ আমার ছেলে নূরনগরী এসেছে। নজির শাহ্ (রহ.) নূর নগরীর (ক.) হাত ছেড়ে দিলেন। তখন হতে হযরত শাহ্ সৈয়দ জমির উদ্দিন আহমদ (ক.) নূর নগরী উপাধিতে ভূষিত হন এবং দেশ-বিদেশে এই নামেই পরিচিতি লাভ করেন। এই প্রথমবার হযরত নূর নগরী (ক.) মাইজভাণ্ডারে তিন দিন অবস্থান করেন। অবস্থানের শেষ দিন নূর নগরী ও আরও দুইজন মৌলভী সাহেব ফজর নামাযের অজু শেষ করে মসজিদে প্রবেশ করেছেন, এমন সময় হযরত কেবলার এক খাদেম এসে বললেন, আপনারা তিনজনকে হযরত কেবলা তাঁর সাথে দেখা করতে আদেশ করেছেন। তাঁরা

হুজরায় উপস্থিত হলে তিনজনকে "দালায়েলুল খায়রাত" অজিফার নাম বলেন। তাঁরা যেন বাড়ি গিয়ে উক্ত অজিফাটি সংগ্রহ করে এক মাস তিন দিন পর অজিফাসহ এসে দেখা করেন। আদেশ মোতাবেক হযরত নূর নগরী (ক.) কুমিল্লা হতে অজিফাটি সংগ্রহ করে পদব্রজে মাইজভাণ্ডার শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ত্রিশটি মসজিদে ত্রিশরাত্র অবস্থান করেন। প্রত্যেক মসজিদে অবস্থানকালে একপারা কুরআন শরীফ পাঠ করে অজিফাটি পড়তেন। এভাবে এক মাস তিন দিন পর মাইজভাণ্ডার শরীফ উপস্থিত হলেন। দরবারে গিয়ে দেখলেন অন্য দুইজন মৌলভী সাহেব তাঁর পূর্বেই দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁরা তিনজন হযরত কেবলার সামনে উপস্থিত হলে হযরত কেবলা একজনের হাত থেকে তাঁর অজিফাটি নিয়ে পাতা উল্টাতে উল্টাতে বললেন; "ইস্‌মে হরফ নেহি হ্যায়"। দ্বিতীয় জনের অজিফা নিয়ে পাতা উল্টায়ে একই কালাম ফরমালেন। শেষে নূর নগরীর অজিফাটি নিয়ে এক এক করে পাতা উল্টায়ে কালাম ফরমালেন, "ইস্‌মে হরফ হ্যায়, ইস্‌মে হরফ হ্যায়, ইস্‌মে কাম হোগা।" নূর নগরীর অজিফাটি হযরত কেবলা নিজের কাছে রেখে দিলেন।

এই মহান আধ্যাত্মিক সাধক অলি-ই কামিল, সাধনাকালে অনেকবার পার্বত্য অঞ্চল ভ্রমণ করেন ও সেখানে অনেক অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ আছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতে তাঁর অনেক ভক্তবৃন্দ রয়েছেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সায়ের বা সফর করেছেন। নূরনগর দরবার হতে তিনটি গজলের বই প্রকাশিত হয়েছে যথা, প্রেম পুষ্পহার, শায়েরে বন্দে আলী ও তৌহিদ তত্ত্ব; যা ভাণ্ডারী ও নূরনগরীর দরবারে সামার মাহফিলে গাওয়া হয়। নূর নগরী (ক.)-এর খেলাফতপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে অনেকেই অলি-ই কামেলে পরিণত হন।

নূরনগরীর (ক.) অনেক কারামত আছে; যেমন মাতৃগর্ভে থাকাকালিন কারামত, পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ কালের অনেক অলৌকিক ঘটনা, রেল দুর্ঘটনার কবল হতে ভক্তকে রক্ষা করা; দুরারোগ্য রোগ থেকে ভক্তের মুক্তি দান, জমিদারীর অধিকার পুনঃপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভবিষ্যতবাণী, পানের মাধ্যমে সন্তান লাভ, ভক্তের অন্তিম মুহূর্তে সশরীরে উপস্থিতি, মুহূর্তে ভক্তকে নিয়ে মাইজভাণ্ডার গমন ও ফিরে আসা, ওফাতের পর মক্কা শরীফে সাক্ষাত দান ও বেসালের পর ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে ভক্তকে বিপদ থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি। তাঁর অনেক কারামত আছে এই ক্ষুদ্র পরিসরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। নূর নগরী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে তাঁর জীবনী শরীফ পাঠ করুন। নূর নগরীর দরবার শরীফে জীবনী শরীফ পাওয়া যায়। তিনি যে কত বড় অলি ছিলেন, তা নিম্নের একটি বর্ণনা থেকে জানা যাবে।

হযরত নূর নগরীর (ক.) এক খাদেম, রামনগরের ফকির আমজাদ আলী সাহেব বর্ণনা করেন, এক মাওলানা ও পীর সাহেব সব সময় নিজ বুজুর্গী সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ফলাও করে অনেক কথা বলতেন। খাদেম সাহেব উক্ত মাওলানার বিষয় নূরনগরী (ক.)-এর নিকট প্রকাশ করলে নূর নগরী (ক.) বলেন যে, এমন বুজুর্গ ব্যক্তিকে আলমে জব্রুতে (বা আকাশ

মণ্ডলে বা দ্যুলোকে) যেখানে সারা পৃথিবীর ৩ শতজন আউলিয়ার সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে দেখিনা কেন? এই কালাম শুনে বুঝ করলাম, আমি যে মহামানবের সাথে কথা বলছি তিনি অসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং বহু ঊর্ধ্ব মোকামের অলি। খাদেম সাহেব বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ হযরত নূরনগরী কেবলার পদচুম্বন করলাম।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুদের পরলোক গমনের বিষয়ে কুরআনে ঘোষণা করেছেন "এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছেন তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাঁহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তাহা অবগত নও" (সূরা বাক্বারা)। হযরত নূর নগরী (ক.) অনাবিল করুণা বারি বর্ষণের পর খোদা তায়ালার তৌহিদ তোরণ চির উন্মুক্ত করে সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরকাল জগতে তাঁর আধ্যাত্মিক লীলা সম্পূর্ণ করে মহাপ্রভুর মহাজাতে মিলিত হতে প্রস্তুত হলেন। ১৩৫২ বাংলা ২রা মাঘ রোজ বুধবার অপরাহ্ন ১-৩০ মিনিটের সময় তিনি প্রিয়তম মাহবুব মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে মিলিত হন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

পীরজাদা এ কে এম রওশন মিঞা
লেখক, নূর নগর দরবার শরীফ।

হযরত আবদুল মজিদ শাহ আজিম নগরী (রহ.)

সৈয়দ জাহেদুল আলম

চট্টগ্রামের বিবিরহাটে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দর্শন সম্পর্কে গবেষণা ও আলোচনা করার জন্য আদর্শবাহী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বিবিরহাট বাজারটি চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জমিদার করম আলী মিয়া তাঁর স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। জনাব করম আলী মিয়া হযরত আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.)-এর ভগ্নিপতি অর্থাৎ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ভায়রা ভাই। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বহু সেবা কেন্দ্রেও জমি দান করেন। জনাব করম আলী মিয়া মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভক্ত ছিলেন।

হযরত মৌলভী শাহ্ সুফি সৈয়দ আবদুল মজিদ শাহ্ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আজিম নগর গ্রামের নাম করা জমিদার সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুন্সী আফাজ উদ্দীন। তিনি হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর বিবি সাহেবানীর সহোদর ভাই। হযরত আকদস এর বিবি সাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা হিসাবে তিনি আশেক-ভক্তের নিকট মামু সাহেব হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আকরগ্রন্থ বেলায়েতে মোত্লাকায় বর্ণিত আছে যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সময় সময় কালাম করতেন ঃ আমার ১২টি সেতারা, ১২টি বুরুজ, ১২টি কাচারী, ১২টি নক্ষত্র। গ্রন্থটিতে লেখক আত্মীয়তার সূত্র ছাড়াও গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ফয়েজপ্রাপ্ত ও বিশিষ্ট খলিফা হিসাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ সম্পাদন করে মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তের মাঝে তিনি বিশেষ সম্মানজনক স্থান অর্জন করেন। তাঁর মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তায় শ্রবণকারীদের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হতো। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে অছি-এ-গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেছেন, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দপ্তরখানায় জনাব আমিনুল হক (ক.) ওয়াসেল-এর অনুপস্থিতিতে হযরত আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.) নেতৃত্ব দিতেন। সেখানে তিনি হালকা-জজ্বা করতেন এবং করাতেন ও তালিম দিতেন। এমন কি হালকা-জজ্বার সময় কাউকে যদি তিনি স্পর্শ করতেন তাঁরও হালকা-জজ্বা গালেব হতো।

জনাব আবদুল মজিদ মিয়া নিজ বাড়িতেও রীতিমত সামা ও হালকা জিকির করতেন এবং করাতেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এক সময় আজিম নগর নিবাসী ফয়েজ উল্লাহ্ মাস্টারের বাড়িতে মাওলানা মহিউদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকামতে হালকা জিকির, সামা ও সেজদায়ে তাহিয়া সম্বন্ধে সমালোচনা ও মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের বিরুদ্ধে ওয়াজ করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। হযরত আকদস এর ভ্রাতুস্পুত্র মৌলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল হযরত সাহেবানীর সহোদর ভ্রাতা, হযরতের ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা আবদুল মজিদ মিয়াকে হুজুরের খেদমতে

পাঠিয়ে আরজ করলেন; হুজুর! আমরা দরবারে পাকে শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে বর্তমানে মহেশখালীর আকাম উদ্দীন, রাঙ্গুনিয়ার খলিলুর রহমান, বাঁশখালীর মৌলানা মোহসেন, সুন্দরপুরের মৌলানা আমিনুল্লা, কাঞ্চনপুরের মৌলানা আবদুল গণি, মৌলানা আবদুস্ সালাম এবং ফরহাদাবাদের মৌলানা আমিনুল হক, হাফেজ তফজ্জল হোসাইনসহ আরো বিখ্যাত আলেমগণ উপস্থিত আছি এবং আমাদের কাছে সকল মোছায়েলা, কিতাব ও প্রমাণাদি মজুদ আছে। আমাদের মাঝে সবাই মোনাজেরায় সুদক্ষ। অনুমতি পেলে মৌলানা মহিউদ্দীনের সাথে মোনাজেরা করতে ইচ্ছা করি। হযরত আকদস বললেন, 'তিনি মুসাবী ত্বরিকার লোক। খিজিরী কাজ-কারবার তিনি কি বুঝবেন, তোমরা ফ্যাসাদ বা বাহাস করো না। আপন হালতে থেকে যাও। তারা তোমাদের সঙ্গে মিলে যাবে।' অন্যদিকে আমিনুল হক ওয়াসেল এর নির্দেশে মজিদ মিয়ার বাড়িতে সামাসহ জজ্‌বার মজলিশ করা হয়। সামা মজলিশ করার সময় যারা আবদুল মজিদ মিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে লাগল, সামার শব্দ কানে আসতেই তাদের জজ্‌বা ও সমস্ত শরীরে আলোড়ন হতে লাগল। সকলে অবাক হয়ে গেল। হিন্দুরা বলাবলি করতে লাগল, এই রাস্তা দিয়ে যাইওনা। এ বাড়িতে মক্কা চালান দিয়েছে। ফলে দেখা গেল, মৌলানা মহিউদ্দীনের মজলিশ জমল না। উক্ত মজলিশ হতে প্রায় সকলে জজ্‌বা হালতে বেখোদ অবস্থায় এই হালকা মজলিশে যোগদান করল। ফরহাদাবাদ এর বিখ্যাত আলেম জনাব আবদুল জলিল সাহেব ওয়াজ মাহফিলে যাওয়ার সময় হযরত আকদস বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, হুজুর আমি ওয়াজ মাহফিলে যাচ্ছি। তখন তাঁকে গাউসে মাইজভাণ্ডারী ওয়াজ মাহফিলে না গিয়ে আবদুল মজিদ মিয়ার বৈঠকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকেই তাঁর সম্পর্কে অবিহত আছেন। মোদ্দাকথা, সামা বা আধ্যাত্মিক গান শুনলেই তাঁর ওয়াজদ বা ভাবাবেশ অবস্থার সৃষ্টি হতো। দরবারে পাকে জটিল কোন সমস্যা হলে জনাব আবদুল মজিদ মিয়াকে দিয়ে হযরত আকদস এর কাছে আরজী পেশ করা হতো। কারণ, হযরত আকদস তাকে খুব ভালবাসতেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে প্রকাশ, ধুরুং খালের গতি পরিবর্তন হওয়ার পর দেশবাসীর অনুরোধে বহু লোক উক্ত খালের স্রোতগতি পূর্ববৎ দক্ষিণ মুখে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। মজিদ মিয়াকে দিয়ে এ আবেদন করা হয়েছিল।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) অনেক আশেক-ভক্তকে হযরত আবদুল মজিদ শাহ্ (রহ.)-এর খেদমত ও তাঁর সাথে চলাফেরা উঠা-বসার নির্দেশ দিতেন। একদা আজিমনগর নিবাসী সৈয়দুল হক নামে এক খাদেমকে মজিদ মিয়ার সাথে উঠা-বসার জন্য নির্দেশ দেন। কিছুদিন পর সৈয়দুল হক ফকির হযরতকে বললেন, হুজুর! মজিদ মিয়া বড় লোক। তাছাড়া তিনি নামায রোজার দপ্তরবন্দী নহেন। এমন অবস্থায় আমার কি উপকার হবে? উত্তরে হযরত কেবলা বলেন, মিয়া! আপনার কুরআন-কিতাব আপনার সাথে, মজিদ মিয়ার কুরআন-কিতাব মজিদ মিয়ার সাথে। আপনি মজিদ মিয়ার সাথে উঠা বসা করবেন। আমি আপনাকে দেখব।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রন্থ 'রত্ন ভাণ্ডার' ১ম খণ্ডে মন্দাকিনী নিবাসী হযরত মাওলানা বজলুল করিম (রহ.) সাহেব রচিত এক মাইজভাণ্ডারী গানের কলিতে মামু সাহেবের অর্থাৎ হযরত মৌলভী সৈয়দ আব্দুল মজিদ শাহ্ সাহেবের আধ্যাত্মিক মোকাম ও মর্যাদা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছেঃ

"প্রেম নূরে নূরানী বাবা মামুজীর চন্দ্রানন,
আবদুল মজিদ শাহ্ আজিম নগরী ধন,
প্রেমের প্রতীক যারা প্রেমের ডাকে দিয়ে সারা
প্রেম আনন্দে ভজ গিয়ে মামুজীর শ্রীচরণ ॥
প্রেম বাগানে কল্পতরু ভাব বাদের দীক্ষাগুরু
ভ্রষ্টেরে দেখাইতে পথ রেখে গেছেন গাউসে ধন ॥
বাবাজির প্রেম অগ্নিতে নর-নারী শতে শতে
জগত যাতনা হইতে পেয়ে গেছেন পরিত্রাণ ॥
অধীন করিমে ভজে মামুজীর শ্রী চরণে
জগত তরাইয়া নিলা দাসের বেলায় মৌন কেন ॥

তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ খেলাফতের উপযুক্ত না থাকায় বড় পুত্র সৈয়দ আবদুল অদুদ সাহেবের বড় শাহজাদা, বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার নাতনী জামাতা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ সুলতান আহমদ শাহ্ (রহ.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও খেলাফত দান করে ১৯৩০ সালের ১ অগ্রহায়ণ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সৈয়দ জাহেদুল আলম
লেখক।

হযরত গাজী মাওলানা এয়াকুব আলী (রহ.)

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন লিটন

ক্ষণিকের এ পান্থশালায় যুগে যুগে অনেক আউলিয়া ও মহা মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা সারা জীবন মানব সেবায় আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন এবং মানুষকে মুক্তি ও শান্তির দিকে আকর্ষণ করেছেন। এসব আউলিয়া ও মহা মনীষীদের মধ্যে হযরত গাজী মাওলানা এয়াকুব আলী (ক.) প্রকাশ শ্রীপুরের গাজী সাহেব হুজুর অন্যতম।

তিনি নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার অধীন হোসেনপুর গ্রামে পাটওয়ারী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত ওয়ালী পাটওয়ারী, মাতার নাম সৈয়দা তৈয়বে নেছা। তাঁর মাতা-পিতা যথেষ্ট ধার্মিক ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে এতিম হয়ে যান। এতিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ হয় নাই। অতঃপর তিনি বাল্য বয়সে এক বয়াতির সাথে নোয়াখালীর সেনবাগ থানার অধীন হরিণকাটা গ্রামে আসেন। সেখানে হরিণ কাটার হযরত ফকির শাহের এই এতিম ছেলেটির উপর দয়া হয়। তাঁকে তাঁর কাছে রেখে লেখা-পড়া শিক্ষা দেন। ফকির শাহের অনুপ্রেরণায় উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিখ্যাত ইসলামী দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখা-পড়া শেষ করে জৈনপুরী হযরত মাওলানা সৈয়দ কেরামত আলী (রহ.) সাহেবের পুত্র বিশিষ্ট বুজুর্গ মাওলানা সৈয়দ আবদুল আউয়াল সাহেব (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এর পর তিনি তাঁর পীরের নির্দেশে চট্টগ্রামে হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর কাছে থেকে পূর্ণাঙ্গ বেলায়েত লাভে ধন্য হন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হযরত গাজী সাহেব হুজুর (ক.) বেগমগঞ্জের অধীন হোসেনপুর গ্রাম থেকে হিজরত করে নোয়াখালীর সেনবাগ থানাধীন বাবুপুর শ্রীপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ফকির শাহ্ (রহ.) নিজের মেয়েকে তাঁর কাছে বিবাহ দেন। এরপর নোয়াখালী জেলার শহর কুতুব চেরাগ আলী শাহ্ (রহ.) তাঁর এক মেয়েকেও গাজী সাহেবের কাছে বিবাহ দেন। কারো কারো মতে তিনি বহু বিবাহ করেন। লোকমুখে প্রচলিত হয় যে, অচলের মালিক গাজী সাহেব হুজুর; অর্থাৎ তিনি যে সমস্ত মেয়ে কুৎসিত, কালো, অন্ধ, পঙ্গু, ল্যাংড়া তাদেরকে বিবাহ করে তাদের ইজ্জতের হেফাজত করেন।

হযরত গাজী সাহেব (ক.) উঁচু স্তরের অলি ছিলেন। তাঁর অনেক কারামত আছে এবং বর্তমানেও নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। যেমন মক্কা-মদীনা মনোয়ারায় বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাজ-কর্ম সম্পাদনের বিভিন্ন সময়ে রূহানী সায়ের, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি, দুইটি ডিম থেকে দুইটি কন্যা সন্তান, তাঁর দেওয়া মিষ্টি কুমড়া উপহার ভারতে এখনও নষ্ট হয় নাই, দূর দূরান্ত থেকে সফরসঙ্গীদের প্রয়োজন মতে চোখ বন্ধ করে এক পলকে নিজের প্রয়োজনীয় স্থানে উপস্থিতি। তিনি বহু হাজতীর হাজত পূর্ণ করেন এবং রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। এক কথায় বলা যায়, তিনি একজন হাজত পূরণকারী বড় দরজার অলি ছিলেন। তিনি যে

কোন হাওয়াই বালা ও আসমানী বালা দূর করতেন। এমনকি বসন্ত ও কলেরা রোগে তিনি গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ্‌র রহমতে উক্ত রোগ হতে মানুষ মুক্তি পেত। বর্তমানে তাঁর আওলাদে-পাকগণও দোয়া করলে যে কোন রোগ থেকে মানুষ আল্লাহ্‌র রহমতে মুক্তি পায়, এই প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়।

গাজীর নামে বহু প্রতিষ্ঠান আছে। গাজীরহাট বাজার, হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা, বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্ট অফিস, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩নং ডমুরুয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, গাজী শিশু মঙ্গল কিন্ডার গার্টেন, কৃষি অফিস নোয়াখালী জেলা শাখা, আকবর আলী খাঁন কারিগরী ও বাণিজ্য (ডিগ্রী) কলেজ, তিনখানা মসজিদ ও বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদি।

প্রতি বছর মাঘ মাসের বিশ তারিখে নোয়াখালীর সেনবাগ থানাধীন বাবুপুর শ্রীপুর গ্রামে অবস্থিত দরবার শরীফে তাঁর উরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন অনেক লোক তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্য দরবারে আসেন। তিনি ১ আশ্বিন ১৩৪৯ বাংলা শুক্রবার বেলা ২টায় (৬ রমযান) তিন জায়গায় ওফাত হন। তিন জায়গায় তাঁর মাজার শরীফ আছে। ১. নোয়াখালীর সেনবাগ থানাধীন বাবুপুর শ্রীপুর (প্রধান)। ২. সিলেট ছাতক গাজীর মাজার। ৩. ভারতের বিষাগড় গনিয়া পাড়া, যা দুলামিয়া সর্দারের বাড়ির পার্শ্বে জিন্দা গাজীর মাজার নামে পরিচিত। আমার বাড়ি তাঁর মাজারের পার্শ্বে হওয়ায় আল্লাহ্‌র নিকট লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতের উচ্চ স্থানে আসন দান করুন। আমিন!

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন লিটন
(এডভোকেট)।

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ফানাফিশ্-শায়খ বাহারুল উলুম আল্লামা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.)

মাওলানা শায়েস্তা খান আল আজহারী

আনুমানিক ১৮৭০ সালে তিনি চট্টগ্রাম জিলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত কাঞ্চনপুর গ্রামে প্রখ্যাত সৈয়দ ও মওলানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফেজ মাওলানা সৈয়দ আবদুল ওহাব (রহ.)। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) মাইজভাণ্ডারী গানের প্রথম গীতিকার। মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যসূত্রে জানা যায় যে, হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) হযরত গাউসুল আযম (ক.)'র মহান বেলায়তী নিয়ামত বিতরণের প্রথম পর্যায়ের খলিফাদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি ফানাফিশ্-শায়খ ছিলেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র শানে রচিত গানগুলো অনেক উচ্চমার্গীয়। তিনি বিভিন্ন সময় তাঁর পীরমুর্শিদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সম্মুখে তাঁর রচিত গানগুলো নিজে গেয়ে শোনাতেন। হযরত কেবলা (ক.) তাঁর এ গানগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শান ও আজমত বর্ণনা করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গান রচনা করেন। অন্তর্গতভাব সম্পদ গুণে তাঁর গানগুলো আজও মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলে সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর মোট গানের পরিসংখ্যান দেয়া সম্ভব নয়। তবে রত্নসাগর নামক মাইজভাণ্ডারী গানের বইটিতে তাঁর রচিত ৯৪টি (চুরানব্বইটি) গান রয়েছে। গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল থেকে প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন গ্রন্থ 'রত্নভাণ্ডার' ১ম ও ২য় খণ্ডে তাঁর এ গানগুলো বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। সংখ্যার বিচারে নয়, অন্তর্নিহিতভাব এবং উচ্চমার্গীয় মর্মার্থ রূহানী উরুজিয়তের অনন্য সোপান এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে এই গানগুলো মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ এবং মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তদের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছে।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) তাঁর রচিত মাইজভাণ্ডারী গানগুলো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সামনে গেয়ে শোনাতেন। হযরত কেবলা আলম তাঁর গানগুলো গভীরভাবে শুনতেন এবং তাঁর গানে কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করতেন এবং তিনি এই গানগুলো 'মসনবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র প্রপৌত্র গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের মোনতাজেম, শাহ্ সুফি সৈয়দ মুনিরুল হক (রহ.)-এর মন্তব্য সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

মাওলানা আবদুল হাদী সাহেব রচিত শে'এর গজলিয়াত হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা সাহেবের খেদমতে পঠিত ও পেশ করা হত। হযরত আকদাস [শাহ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী] সেগুলো মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে 'মসনবী' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। সে সময় থেকে উক্ত শে'এরগুলো হযরত আকদাস

কেবলার অনুমোদিত জ্ঞানে মাওলানা হাদী ও অন্যান্য আশেকানে দরবার দ্বারা হযরত আকদাস ও বাবাজান কেবলার [হযরত বাবা ভাণ্ডারীর] খেদমতে এবং জিকির জজ্বা মাহফিলে অজিফা হিসেবে পাঠ করার নীতিরূপে প্রবর্তিত হয়ে আজও প্রচলিত আছে। হাদী সাহেবের বহু গজলিয়াত হযরত বাবাজান কেবলার কণ্ঠস্থ ছিল এবং তাঁকে পাঠ করতেও দেখা যেত। হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ছোট মওলানা সাহেব) কেবলা উক্ত শে'এর সমূহকে জিকিরের অন্তর্ভূক্ত করে জজ্বা হালকা সামার মাহফিলে পাঠের নির্দেশ প্রদান করতেন। মওলানা আবদুল হাদী সাহেব একজন উচ্চাঙ্গের ভাষাবিদ ও রমুজাতের ওলী ছিলেন। তাই তাঁর রচিত পদাবলী সালেকের মনে ইশ্‌ক ও মহব্বতের প্রেরণা, আল্লাহ্‌র দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষা ও নিখুঁত সোজা সরল পথের সন্ধান দেয়।"

খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) এর বড় ভাই বাহারুল উলুম আল্লামা আব্দুল গণী কাঞ্চনপুরী (রহ.) যিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র শানে "আয়নায়ে বারীর" প্রণেতা এবং তাঁর ছোটভাই হযরত আল্লামা আব্দুছ ছালাম ভুজপুরী (ক.)। এই সৌভাগ্যবান তিন সহোদরই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফা। তন্মধ্যে হযরত আল্লামা আব্দুল হাদী (রহ.) প্রথম দিক থেকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সান্নিধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শানে গজল তথা মাইজভাণ্ডারী গান রচনায় তিনি প্রথম ব্যক্তিত্ব। তাঁর বড় ভাই আব্দুল গণি কাঞ্চনপুরী (রহ.) প্রথম দিকে মাইজভাণ্ডার শরীফের মুন্‌কের [নিন্দাকারী] ছিলেন। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক বছর বিতর্ক ছিল। পরিশেষে তিনিও হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সমীপে আত্মসমর্পণ করে তাঁর কদমে উৎসর্গীত হন।

হযরত আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কদমে উৎসর্গীত হয়ে বেলায়তের কত উঁচু স্থানে আরোহন করেছেন তা তাঁর রচিত কালামগুলো গবেষণা করলে সহজে অনুমান করা যায়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দর্শন ছিল উচ্চস্তরের বেলায়তের সোপান। হযরতের দয়ায় ঐ স্তরে উপনীত হলে তাঁর কোন জাগতিক কামনা বাসনা তো থাকে না বরঞ্চ তাঁর আখেরাতের চির সুখের নীড় জান্নাতের (বেহেশ্‌তের) আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। খোদাপ্রেমে মগ্ন হওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না। এটা হচ্ছে সুফিতত্ত্বে সর্বোচ্চ মকাম 'ফানাফিল্লাহ্‌র' স্তর। এই মহিমান্বিত মোকামের কথা তিনি তাঁর কালামে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

মজেছি তোমারো প্রেমে স্বর্গ সুখ চাহি না
কি করিব স্বর্গ সুখ তোর ভাবেতে দিওনা

খোদা প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার আদব তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর কালামের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে নিজেকে কুরবানী দেয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে যে কত সংযত ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেটা তিনি নবী রাসূল তথা ঈমাম হোসাইন (রাঃ)'র কুরবানীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন।

তাপি মন প্রিয়ার কাছে প্রেম তাড়নায় আর কেঁদনা
প্রেম শাস্ত্রে নিষেধ আছে নয়ন জল আর ভাসাইওনা

এই কালামে তিনি কুরআনে পাককে খোদা প্রেমের বিধান গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, কুরআন পাকে আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করেন–

সেদিন কারও ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসবে না কিন্তু ঐ ব্যক্তি উপকৃত এবং কামিয়াব হবে যে পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আসবে।

হযরত আব্দুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রহ.) এর মতে যাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূল প্রেমে মগ্ন হয়ে অন্তর আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও পুত-পবিত্র করতে চায় তাদেরকে তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.)'র সান্নিধ্যে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, আগন্তুকের জাগতিক কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নাই, এমনকি পাপ পঙ্কিলতায় জড়িত হলেও কোন অসুবিধা নাই বলেও অভয় দিয়েছেন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দরবারে আকদসকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রেমের বাজার বা জংশন বলেছেন এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'কে মহান রূহানী অঙ্গনের মহাজন তথা দীক্ষা গুরু বলেছেন–

চলোগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার
প্রেমহাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাঝার

তাঁর পবিত্র তাৎপর্যপূর্ণ ও বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাধর্মী রচিত কালাম সমূহের প্রতিটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বেলায়তে মোত্লাকা বা অর্গলমুক্ত প্রেমবাদের পরিচয় বহন করে। যা জ্ঞানী-গুণী মণীষীদের চিরায়ত গবেষণার খোরাক। এই মহান মণীষী হযরত আকদসের প্রেমে এমন ফানা ছিলেন যে, হযরত আকদসের ইহ জাগতিক বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারবেন না এই আশংকায় তিনি হযরত এর ওফাতের ৭ মাস কয়েকদিন পূর্বে ১৯০৫ সালের ২০ আগস্ট, ১৮ জামাদিউস্ সানী ১৩২২ হিজরী মোতাবেক ১৩১২ বাংলার ৫ ভাদ্র বেসালে হক প্রাপ্ত হন। সূত্রঃ আপ্ত দর্পণ, আবদুছ ছালাম ভুজপুরী।

মকবুলে বারগাহে সমদানী ওয়াকিফে আসরারে রহমানী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী (রহ.)

মাওলানা বোরহান উদ্দীন মুহাম্মদ শফিউল বশর

প্রাককথন: ইলমে জাহের ও বাতেনের সমন্বয়ে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আল্লামা কাঞ্চনপুরী (রহ.)। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিকে মানবজাতির উত্তম আদর্শ মহানবী (দ.)'র চারিত্রিক মাধুর্যে প্রস্ফুটিত। তাঁর মস্তিস্কের প্রতিটি কোষে হাসানী ও হুসাইনী প্রেরণা, চেতনা ও ভাবধারা প্রদীপ্ত। হাদীসে রাসূল মর্মে তিনি সফিনায়ে নূহ্ বা নূহ্ (আ.)'র কিস্তি সদৃশ্য। গোমরাহীর তুফানে উম্মতের তরী নিরাপত্তার পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন সুচারুরূপে। তাইতো তাঁর আদর্শ ও লিখনী আজও মানুষকে প্রতিনিয়ত ডাকছে সত্য ও সুন্দরের পথে।
'এনদা যিক্‌রিস্‌সালেহীনা তাতানায্‌যালুর রহমতু' অর্থাৎ 'পুন্যবানদের চর্চাকালে 'প্রভু অনুগ্রহ' অবতারিত হতে থাকে।'

নাম: আল্লামা সৈয়্যদ আবুল বরাকাত মুহাম্মদ আব্দুল গনি কাঞ্চনপুরী, কবিত্বপূর্ণ নাম আচ্ছাফী ও আল মকবুল রহমতুল্লাহি আলাইহি।

জন্ম: তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়সের আনুমানিক যে তথ্য দেন তদ্‌মতে তার জন্ম সন যথাক্রমে ১৮৬৪, ১৮৬৫, ১৮৬৬, ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের যে কোন একটি বলে ধরে নেয়া যায়। অধিকাংশের ধারণা মতে ১২৭৯ হিজরী, ১২৭১ বাংলা, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ। তিনি চট্টগ্রামস্থ ফটিকছড়ির ধুরুং ইউনিয়নের সুপ্রসিদ্ধ সৈয়্যদ ও মাওলানা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)'র বংশধর। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ। সৈয়্যদ আবুল বরাকাত আব্দুল গনি আচ্ছাফী আল মকবুল কাঞ্চনপুরী তদ্‌পিতা সৈয়্যদ হাফেজ মাওলানা আব্দুল ওহাব তদ্‌পিতা সুফি মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ বুরহানউদ্দীন তদ্‌পিতা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আশরাফুদ্দীন তদ্‌পিতা সৈয়্যদ সুফি সাদেক (রহ.)।

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা: হযরত মাওলানা সৈয়্যদ সাদেক (রহ.) ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়িস্থ ধুরুং ইউনিয়নে বসতি স্থাপন করেন। তারই বংশধর কাঞ্চনপুরী (রহ.)'র পিতা হাফেজ মাওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওহাব (রহ.) বোচা উকিল প্রতিষ্ঠিত কাঞ্চনপুর জামে মসজিদের ইমাম নিয়োজিত হলে তথায় সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। এখানেই কাঞ্চনপুরীর শৈশব অতিবাহিত হয়। তিনি আপন পিতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

সফর ও উচ্চ শিক্ষা: তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য কলিকাতা সফর করেন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, উসূল, নাহু, ছরফ, মান্তেক, ইল্‌মে কালাম, আদব, বালাগাত ও ফালসাফা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনপূর্বক সফলতার সাথে শিক্ষা সমাপনান্তে হাদীস, ফিক্‌হ ও তাফসীরের সনদ লাভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার দরুন তিনি সমসাময়িক ওলামাদের নিকট 'বাহরুল উলুম' বা জ্ঞান সমুদ্র বলে পরিচিতি লাভ করেন।

ত্বরিকতের দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান: জনশ্রুতি আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে মাইজভাণ্ডার দরবারের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ভাই মাওলানা আব্দুল হাদি (রহ.) ছিলেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মুরিদ ও খলিফা। উভয়জনের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রায় সময় তর্ক-বিতর্ক হতো।

তাই তিনি ঘরের উঠানে ৮ হাত লম্বা বেড়া দেন, যাতে হাদী সাহেব কেবলার মুখ দেখা না যায়। একদা রাত্রে আল্লামা হাদী সাহেব কিবলা (রহ.) বেহালা বাজিয়ে গান গাইতেছিলেন। গানের সুর আল্লামা মকবুল (রহ.) কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করে। তিনি বেড়া ডিঙ্গিয়ে হাদী (রহ.)-এর ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি দরজা খুলতে বললে, হাদী (রহ.) প্রথমে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তীতে অত্যধিক মিনতি হেতু খুলে দেন। তিনি গুলিবিদ্ধ পাখির ন্যায় ছটফটাতে ছটফটাতে হাদীর গৃহে প্রবেশ করেন। অতঃপর বলেন, আমার কোন গতি কর। তোমার গান আমার হৃদয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার হৃদয় তন্ত্রীতে প্রেমের বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলছে। প্রেমজ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এ জ্বালা কিসে নিবারণ করব? উপায় বাতলিয়ে দাও।

আল্লামা হাদী (রহ.) বললেন, আমি ও আপনার মত একই রোগের রোগী, আমি আপনার চিকিৎসা করবো কি করে? তবে আপনার সাথে আমার তফাৎ হচ্ছে আমার চিকিৎসক আছে। আপনার নেই। আপনি ইস্তেখারা করে দেখুন, কোথা গেলে সে চিকিৎসকের নাগাল পাবেন।

আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। উক্ত রাতেই তিনি স্বপ্নে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দর্শন লাভে ধন্য হন। অতঃপর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে পড়েন।

পরদিন প্রাতে তাঁর ভাই হযরত হাদী (রহ.)'র সাথে দরবারে পাকে গিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাকে খেলাফত প্রদান করেন এবং স্নেহ করে মকবুল বলে ডাকতেন। ত্বরিকতের দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে সমস্ত জীবন আপন মুর্শিদে কামিলে মুকাম্মিলের চরণ সেবায় এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার খেদমতে উৎসর্গ করেন।

কর্মজীবন: তিনি কলিকাতা থেকে এসে মিরেরসরাই লতিফিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর বোচা উকিল প্রতিষ্ঠিত কাঞ্চনপুর জামে মসজিদে ইমামতি করেন। সেখানে মসজিদের মুতাওয়াল্লীসহ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা বিরোধী লোকদের সাথে তাঁর মতান্তর শুরু

হয়। এক পর্যায়ে মুতাওয়াল্লী তাঁকে বলেন, আপনি যদি মাইজভাণ্ডার শরীফ যাওয়া আসা বন্ধ করেন, আপনাকে বিরাশি দ্রোন জমি দেওয়া হবে। একদিকে পার্থিব ঐশ্বর্যের হাতছানি, অপরদিকে ঐশী প্রেমের আকর্ষণ। আল্লামা মকবুল তাচ্ছিল্যের সাথে মুতাওয়াল্লীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁকে নিবৃত্ত করতে না পেরে মুতাওয়াল্লী আরো কিছু লোক জুটিয়ে নেন। মসজিদে সকলের উপস্থিতিতে তিনি বলেন, "আপনি ইমামতি করতে চাইলে মাইজভাণ্ডার ছাড়তে হবে। মাইজভাণ্ডারে যাওয়া আসা বন্ধ না করলে ইমামতি ছাড়তে হবে। দু'টার একটা রাখতে পারবেন। উভয়টা এক সাথে করা চলবে না।" আল্লামা কাঞ্চনপুরী বিনা দ্বিধায় "আমি ইমামতির লালায়িত নই,"...আরো অনেক কথা বলে মাইজভাণ্ডার বিরোধী লোকের সম্মুখ দিয়ে সোজা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যান। মসজিদের সম্মুখস্থ পুকুরে খড়ম পায়ে পানির উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে পূর্বপাড়ে পৌঁছেন। অতঃপর উক্ত বোচা উকিল বাড়ির আরো কিছুদূর পূর্বে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে অলির মা'র জামে মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হন এবং প্রায় ২৪/২৫ বছর ইমামতি করেন।

চরিত্র ও মর্যাদাঃ তিনি নম্র, ভদ্র, উদার প্রকৃতির, সাদা-সিদে জীবন যাপনে অভ্যস্ত সুন্নাতে মুস্তাফার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তার মত উদার ব্যক্তিত্ব বিরল। জানা যায়, যে মুতাওয়াল্লী তাঁকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, সমাজ জীবনে আরো বহু কষ্ট দিয়েছেন, সেই মুতাওয়াল্লী মারা গেলে তিনি জানাযার ইমামতি করেন। জানাযার পর বলেন, তিনি আমার বড়ই বন্ধু ছিলেন। যদি আমি পুলসিরাত পার হতে পারি তবে তাকেও পার করাব। শত্রুকে এমন নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তে ক্ষমা করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তিনি 'ওয়াল কা-জিমীনাল গাইজা ওয়াল'আ-ফীনা আন্নি না-ছি; ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহ্ছিনীন' অর্থাৎ যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন।' তিনি সূরা আল-ইমরান ১৩৪ নং আয়াতের বাস্তব নমুনা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম (রহ.) বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমে কামেল অলি আল্লাহ্ ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে বাহ্রুল উলুম বা জ্ঞান সাগর অভিধায় অভিহিত করতেন। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

রচনাবলীঃ তিনি ইসলাম ধর্ম-দর্শন ও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার উপর আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লেখ করা হল।

১. আয়নায়ে বারী ফি তারজুমাতে গাউছিল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-গ্রন্থখানা সূক্ষ্মতত্ত্বের ভাণ্ডার। যদিওবা এটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) চরিত্র আখ্যান, তথাপিও এটা প্রভুর রূপ দর্শনের আলোকিত দর্পণ। গ্রন্থকার প্রদত্ত 'আয়নায়ে বারী' বা প্রভুর দর্পণ নামটিই এ দাবীর জ্বলন্ত প্রমাণ। এটি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের নির্যাস; শরীয়ত, ত্বরিকত, মারেফাত ও হাকীকতের সারতত্ত্ব। অপূর্ব রচনা শৈলী, শব্দের গাঁথুনি, অনুপম গ্রন্থনা, ভাষার লালিত্য, ছন্দের যথার্থতা, গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে এক অতুল্য

সাহিত্য। এটাকে একই সাথে গজ্জালীর এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ও কিমিয়ায়ে সা'দাত, দাতাগঞ্জে বখশ লাহোরীর কাশ্‌ফুল মাহ্‌যুব, হুযুর সৈয়্যদুনা গাউসুল আযম জিলানীর ফত্‌হুল গায়ব ও গুনিয়তুত্‌ ত্বালেবীন, মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবীর ফছুছুল হেকম, ফতুহাতে মক্‌কিয়া ও আর্‌রিসালাতুল অজুদিয়াহ, রুমীর মসনবী, খসরু ও হাফেজ সিরাজীর দিওয়ান ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি বলা চলে।

গ্রন্থটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অনুমতিক্রমে লিখিত, চার অধ্যায়ে আটাশ পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত। ১৪ জমাদিউস্‌ সানী ১৩৩০ হিজরী বুধবার আসরের নামাযের সময় গ্রন্থটি লিখে সমাপ্ত করেন। তার সুযোগ্য সন্তান তত্ত্বজ্ঞান ধারক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ ফজলুল বারী (রহ.)'র অনুমতিক্রমে অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক ইমপ্রিন্টিং প্রেস, চন্দনপুরা থেকে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তা মুদ্রিত হয়।

প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধরূপে অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত আল্লামা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক লিখিত মতামতের কিয়দংশ এখানে উপস্থাপিত হল। "তিনি হযরতের মর্জিমতে উক্ত কেতাবখানি লিখিয়াছেন। তাহাতে হযরতের বেলায়তের দরজা, মরতবা, কারামাত এবং খোছুছিয়াতে খাচ্ছা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৌহিদ ও তাসাওউফের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারী বিষয়ে যাবতীয় মছায়েলা-মছায়েল, কোরান, হাদিস, এজমা, কেয়াছ এবং পূর্ববর্তী ত্বরিকাদির তফসীল দিয়া খোলাছা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। উক্ত কেতাব পাঠ করিলে মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সম্বন্ধে যে ভুল বুঝাবুঝি হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে এবং তৌহিদ ও তাসাওউফ সম্বন্ধে একটি নতুন আলোকপ্রাপ্ত হইবে। খাছ করিয়া মাইজভাণ্ডারী ভক্তগণের জন্য ইহা একটি অমোঘ উপকারী কেতাব।'

আরবী, ফার্সী, উর্দূ, হিন্দি ভাষার সমন্বয়ে এক অনন্য গ্রন্থ আয়নায়ে বারী। ইসলাম ধর্ম দর্শনের নিখাদ দর্পন কলমের আঁচড়ে যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ় বাঁধনে দীপ্ত। প্রতি মুহূর্তে চমকের দোলায় চমকে ওঠে পাঠক। উন্মুক্ত হয় বিবেকের রুদ্ধদ্বার। উদ্বেলিত হয় অনন্ত প্রেমাবেগ। অপসারিত হয় অন্ধকার পর্দা। গ্রন্থটি প্রত্যেক খোদান্বেষীর জন্য অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছারযোগ্য-গাইড লাইন। মুরিদ বা উদ্দেশীর জন্য মুরাদ বা উদ্দেশিত। রুগ্ন অন্তরের চিকিৎসায় একই সাথে ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

(২) প্রেম দর্পণ (৩) গুলশানে উশ্‌শাক। প্রথম মুদ্রণ ১৩২৮ বাংলা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০২ বাংলা, ২ ও ৩নং পুস্তকদ্বয় অধ্যাত্ম চেতনায় স্বীয় মুর্শিদের নিবেদনে রচিত। এর প্রতিটি ছত্রে ঐশীপ্রেমের বন্দনা ও ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের বর্ণনা। (৪) আত্মপাঠ (৫) আত্মপরিচয়- এ দু'টি পয়ার ছন্দে তত্ত্বমূলক পুস্তক। হাদীসের বাণী 'মান আরাফা নফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে নিশ্চয় সে আপন প্রভুর পরিচয় লাভ করেছে। গ্রন্থদ্বয়ে আত্মপরিচয় বিবৃত। এতেও ওয়াহ্‌দাতুল অজুদের ভাবধারা প্রস্ফুটিত। (৬) মুশাহেদায়ে মকবুলিয়া মিন ফয়ুজাতে গাউছিয়তিল আহমদীয়া (৭) পন্দনামা (৮) মজাকে ইশ্‌ক

[দিওয়ানে ছফী] (৯) দিওয়ানে মকবুল (১০) জ্ঞান দর্পন (১১) শরাহুল মুনাব্বেহাত (১২) তন্‌কীহুল মফ্‌হুম (১৩) শর্‌হে কুল্লিয়াতে খাকানী ও (১৪) জলওয়ায়ে নূরে মুহাম্মদী (দ.) ইত্যাদি। ৬ থেকে ১৪ নম্বর পর্যন্ত ৯টি গ্রন্থ অপ্রকাশিত। এগুলোর প্রকাশ সময়ের দাবী। এতে তাসাওউফধর্মী সাহিত্য সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে।

ইন্তেকাল: এ মহান ব্যক্তিত্ব মতান্তরে ৫৯, ৬০, ৬২ ও ৬৩ বছর বয়সে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৬ কার্তিক, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর ২৬ রবিউস্‌সানী ১৩৪৫ হিজরী শনিবার আপন মাহবুবে হাকীকির মিলনে পরলোক গমন করেন। তাঁর পীর ভাই গাউসুল ওয়াক্ত আল্লামা সৈয়্যদ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। তাঁকে নিজ বাসভবনের আঙ্গিনায় সমাধিস্থ করা হয়। আল্লাহ্! প্রত্যেককে এ মহা মনীষীর বদৌলতে উভয় জগতে সফলতা দান করুন। আমিন, বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লামা।

(মাসিক আলোকধারা, ১৪শ-বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, জুলাই ২০০৯ এর সৌজন্যে)

আলোকধারা বুকস

এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের প্রকাশন

০১) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরীফ
- জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২)

০২) ঐশী আলোর জলসাঘর - মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৮৪)

০৩) Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari
- Syed Mohd. Amirul Islam (1992)

০৪) The Divine Spark - Md. Ghulam Rasul (1994)

০৫) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব
- সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৭)

০৬) কুরআন-হাদীসের আলোকে সিজদা/সেমা প্রসঙ্গ - হাফেজ আবুল কালাম (২০০০)

০৭) হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ওফাত শতবার্ষিকী বিশেষ
প্রকাশনা (মাসিক আলোকধারা) - সম্পাদনা, মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৬)

০৮) তাজকেরাতুল মাইজভাণ্ডারিয়া (২০০৮)

০৯) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার
শরীফের ভূমিকা - মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)

১০) মাইজভাণ্ডার শরীফ পরিচিতি - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৪)

১১) মাইজভাণ্ডারী জীবন-বোধ ও কর্মবাদ [একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্ষেপণ]
- মোঃ মাহবুব উল আলম (২০১৫)

১২) হযরত শেখ নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রঃ) : জীবন ও কর্ম
- প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী (২০১৫)

১৩) ছহীহ নূরানী অজিফা (২০১৫)

১৪) উরস-হাদিয়ার তরতীব (২০১৫)

১৫) কালাম-এ-শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (২০১৫)

১৬) তারাভীহ নামায - ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৬)

১৭) রমেশ শীল, মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৭)

১৮) ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)

১৯) এসো গল্প করি- মুহাম্মদ ওহিদুল আলম (২০১৭)

২০) ওয়াসীলা গ্রহণঃ একটি ইসলামী বিধান- ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)

২১) তায্‌কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া-

২২) তাসাওউফ সংলাপ

[পুস্তকের পাশে প্রথম সংস্করণের সন উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে ১নং পুস্তকের ইতোমধ্যে দ্বাদশ সংস্করণ এবং ২নং থেকে ১০নং পুস্তকগুলোর
প্রত্যেকটার একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।]